অন্ধকারের বন্ধু

হেমেন্দ্রকুমার রায়

অন্ধকারের বন্ধু

হেমেন্দ্রকুমার রায়

ইবই নির্মাণ ও সম্পাদনা
শিশির শুভ্র

www.shishukishor.org
books.shishukishor.org

Please donate us

Keep shishukishor.org alive

bKash : 01763754754

পরিচয়

হেমন্ত চৌধুরীকে আমি ছেলেবেলা থেকে অসাধারণ মানুষ বলে মনে করে আসছি। পাঠশালা থেকে ইস্কুল, ইস্কুল থেকে কলেজে। আমরা দুজনে বরাবরই একসঙ্গে শিখেছি লেখাপড়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ধাপ পর্যন্ত ওঠবার পরেও জীবনের যাত্রাপথে আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়নি—সাধারণত যা হয়ে থাকে। তার কারণ, আমরা দুজনেই ছিলুম স্বাধীন। আরও নানান দিকেই আমাদের দুজনের মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায়। আমরা দুজনেই ধনীর সন্তান এবং দুজনেই শৈশবে বাপ-মাকে হারিয়েছি। দেহচর্চার দিকে আমাদের দুজনেরই একান্ত ঝোঁক—কুস্তি, যুযুৎসু, বক্সিং (সঙ্গে সঙ্গে লাঠি তলোয়ার খেলা) কিছুই শিখতে বাকি রাখি নি- যদিও প্রতিযোগিতায় বরাবরই হেমন্ত হয়েছে প্রথম এবং আমি হয়েছি দ্বিতীয়। আমরা দুজনেই দেশে দেশে বেড়াতে ভালোবাসি এবং যৌবনেই ইউরোপ-আমেরিকা পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। আমরা দুজনেই বিবাহ করিনি এবং ঘটকরা বাড়ির চৌকাঠ মাড়ালেই ঘুঁষি পাকিয়ে তেড়ে যাই।

কিন্তু আমাদের দুজনের দিন ও সময় কাটাবার উপায় একরকম নয়। কারণ, হেমন্ত করে শখের গোয়েন্দাগিরি, আর আমি করি শখের সাহিত্য-সাধনা।

আমার সাহিত্য-সাধনার কথা নিয়ে এখানে কিছু বলবার দরকার নেই। আমি আজ কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি। অন্য কারণে।

গোয়েন্দাগিরিতে আজকাল হেমন্ত এমন সুনাম কিনেছে যে, আমার মুখ থেকে নানা লোকে তার কাহিনী শোনবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এজন্যে হেমন্তেরও কাছে অনেকে ধর্ণা দিতে ছাড়েন না। কিন্তু একদিক দিয়ে সে হচ্ছে বেজায় লাজুক-নিজের বাহাদুরির কথা নিজের মুখে জাহির করতে রাজি হয় না কিছুতেই। তখন সবাই আমাকে নিয়ে টানাটানি করেন এবং আমাকেও নিরুপায় হয়ে তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে হয়। কিন্তু বারে বারে নানা জনের কাছে মুখে মুখে হেমন্তের কত গল্প আর বলব? তাই এবার স্থির

করেছি, লোকের আগ্রহ নিবারণের জন্য হেমন্তের কীর্তিকাহিনী ছাপার হরফে প্রকাশ করব একে একে।

আমি শুরু করব একেবারে গোড়া থেকেই, অর্থাৎ হেমন্ত সর্বপ্রথমে যে মামলার কিনারা করে দেশ-বিদেশে যশস্বী হয়ে ওঠে, আগে তার কথাই লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাই। কিন্তু তারও আগে হেমন্তের আরও কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার মনে করি।

ম্যাজিকের আমগাছ দর্শকদের চোখের সামনে গজিয়ে ওঠে হঠাৎ। কিন্তু হেমন্ত অকস্মাৎ পুরোদস্তুর গোয়েন্দা হয়ে পড়েনি, এজন্যে তাকে সাধনা করতে হয়েছে দস্তুর মতো।

ছেলেবেলা থেকেই কাল্পনিক গোয়েন্দা কাহিনী পড়বার জন্য তার অতিশয় ঝোঁক ছিল। এবং আজ পর্যন্ত সে পাঠ করেনি, পৃথিবীতে এমন বিখ্যাত গোয়েন্দার গল্‌প বাে◌ধহয় নেই। কিন্তু এই সব কাল্পনিক এবং প্রায়ই অতি উদ্ভট কাহিনী পড়ে কোনোদিনই সে বিশেষজ্ঞ হবার চেষ্টা করেনি!

সে ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়েছিল প্রধানত এক উদ্দেশ্য নিয়ে। পাশ্চাত্য দেশের সত্যিকার গোয়েন্দারা কোন কোন পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে, সে গিয়েছিল হাতেকলমে তাই শেখবার জন্যেই। এদেশের পুলিস বিভাগের কয়েকজন উচ্চতম কর্মচারির কাছে থেকে সে খানকয় সুপারিশ পত্র জোগাড় করেছিল, তারই সাহায্যে গোয়েন্দা বিভাগের ভিতর থেকে পাশ্চাত্য-পুলিসদের কাজ দেখবার সুযোগ তার হয়েছিল।

ইউরোপের দেশে দেশে গোয়েন্দা-পুলিসদের কার্যপদ্ধতি আছে নানারকম। তারই মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান ও অস্ট্রিয়ান পুলিসের পদ্ধতি। হেমন্ত এই চার-রকম পদ্ধতি নিয়েই বিশেষভাবে আলোচনা করবার অবসর পেয়েছে।

সেকালকার পুলিসরা কাজ করত অনেকটা অন্ধের মতো। বিজ্ঞান ছিল তখন শিশু এবং বিজ্ঞান যেটুকু জানত, পুলিস সেটুকু সাহায্যও গ্রহণ করা দরকার

মনে করত না। বার্টিলনের মাপ নেবার বা আঙুলের ছাপ নেবার পদ্ধতি তখন আবিষ্কৃত হয়নি। ক্যামেরা, মাইক্রোসকোপ ও রসায়নশাস্ত্রের কাছ থেকেও পুলিসের কিছু লভ্য ছিল না। রক্তের মতো কোনও দাগ দেখলেই পুলিস তাকে গ্রহণ করত রক্ত বলেই; তা রক্ত কি না এবং রক্ত হলেও তা মানুষের বা পশুর রক্ত কি না, কিংবা তা বিশেষ কোনও মানুষের রক্ত কি না, এসব জানবার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু একালের উন্নত বিজ্ঞান এসে পুলিসের অন্ধতা অনেকটা দূর করে দিয়েছে।

এই বিজ্ঞানের দিক দিয়ে হেমন্ত ছিল যথেষ্ট অগ্রসর। সে বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে এম. এস.সি পাশ করেছিল এবং এখনও নিয়মিতভাবেই বিজ্ঞানচর্চা করে। গোয়েন্দাগিরিতে বিজ্ঞানকে সে এমন কৌশলে কাজে লাগাতে পারে যে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আজ আমি যে কাহিনীটি বলতে বসেছি, পাঠকরা তার মধ্যেও হেমন্তের বৈজ্ঞানিক তীক্ষ্ণবুদ্ধির খানিকটা পরিচয় লাভ করবেন।

বাংলাদেশের অপরাধীদের সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহের জন্যে সে এখানকার পুলিসের বহু হোমরাচোমরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছে। যদিও কোনও দেশেরই পুলিস বাইরের শখের গোয়েন্দাদের বিশেষ খুশির চোখে দেখে না, বরং তাদের মনে করে অকেজো উড়ো আপদের মতো। কিন্তু কলকাতায় পুলিসের কোনও কোনও কর্মচারীর ব্যবহার দেখলে বেশ বোঝা যায়, হেমন্তের মতামতের উপরে তাদের শ্রদ্ধার অভাব নেই।

এর কয়েকটি কারণও আছে। প্রথমত, হেমন্ত না ভেবেচিন্তে যুক্তিহীন কোনও কথাই বলে না। দ্বিতীয়ত, তার বক্তব্য সে অতি বিনীতভাবে প্রকাশ করে। পুলিসের লোকের সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, গুরুর সামনে ছাত্র যেন নিজের মতামত নিবেদন করছে। কাজেই, তার কাছে সাহায্য চাইতে এলেও পুলিসের অহমিকা বা হামবড়াই ভাব আহত হয় না।

হেমন্ত খালি পুলিসের সঙ্গেই মেলামেশা করে না। এদেশের চোর, গাঁটকাটা, গুণ্ডা, খুনি ও দাগি পুরাতন পাপীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যে তার আগ্রহ এত বেশি যে, মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়, কোনদিন সে হয়তো সাংঘাতিক বিপদে পড়বে। মুসলমানের ছদ্মবেশ পরে প্রায়ই সে মেছোবাজারের ও শহরের অন্যান্য কুখ্যাত পাড়ার বস্তি এবং কফিখানায় ঢুকে অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। ফলে এমন অনেক কদমাইশের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে, যাদের রাস্তার আনাচে-কানাচে দেখলে ভদ্রলোকদের বুক ভয়ে না কেঁপে পারে না!

আমি যদি বলি, হেমন্ত, ওদের সঙ্গে মিশতে তোমার ঘৃণা হয় না?

হেমন্ত হেসে বলে, না ভাই রবিন, মোটেই নয়। ডাক্তাররা ঘৃণা ভরা মন নিয়ে যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের কাছে যান না। আমিও হচ্ছি আর এক শ্রেণীর ডাক্তারের মতো আর অপরাধীদের মনে করি রোগীর মতো। সাধারণ রোগীদের দেহ হয় ব্যাধিগ্রস্ত, আর এ ব্যাধি আক্রমণ করে অপরাধীর দেহকে নয়, মনকে। চুরি, জুয়াচুরি, খুন, ডাকাতি মানসিক ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। ওসব ব্যাধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হলে অপরাধীদের সঙ্গে ভাব না করলে চলে না।

সাজাহানের পাঞ্জা

হেমন্তের বাড়ির একতলায় পাশাপাশি দুইখানি হলঘর ছিল। তার একখানি হচ্ছে পরীক্ষাগার। সেখানে আছে একটি সুদীর্ঘ টেবিলের উপরে নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং দেওয়ালের তাকে তাকে সাজানো হরেক রকম তরল ও চূর্ণ রাসায়নিক পদার্থে ভরা কাচের জার, শিশি ও বোতল।

আর একখানি ঘর হচ্ছে একসঙ্গে তার বৈঠকখানা ও লাইব্রেরি। তার চারিদিকের দেওয়াল ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে বড়ো ছোটো, রোগামোটা কেতাব ভরা আলমারি এবং মাঝখানে ধবধবে চাদর বিছানো নরম বিছানা ভরা চৌকি, চেয়ার, সোফা, কৌচ ছোটো ছোটো টেবিল প্রভৃতি।

সেদিন বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি কৌচে বসে হেমন্ত কোলে-পাতা একখানা বইয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

চেয়ারে বসে পড়ে বললুম, কি হে ভায়া, অত মন দিয়ে কি বই পড়া হচ্ছে?

হেমন্ত মুখ তুলে বললে, বই পড়ছি না ভাই, ছবি দেখছি! এখানা হচ্ছে 'ক্যালকাটা পুলিস জার্নাল।

—পুলিস জার্নালের ছবি? তাহলে নিশ্চয়ই তোমার কোনও স্যাঙাতের-অর্থাৎ চোর কি খুনির চেহারা?

—না রবিন, তোমার রসিকতা মাঠেই মারা গেল। এ ছবি দেখে আমি এক পৃথিবী বিখ্যাত অমর শিল্পীর কথা ভাবছি।

—কি সর্বনাশ! পুলিসের শনির দৃষ্টি আজকাল কি শিল্পীদেরও ওপরে গিয়ে পড়েছে?

—রবিন, পুলিসের ওপরে অকারণে তুমি এতটা নির্দয় হয়ো না। আর পুলিসের দৃষ্টি শিল্পীদের ওপরে পড়বেই বা না কেন, শুনি? শিল্পী মানেই কি সাধু? ফ্রান্সের বিখ্যাত কবি ভিলেন কি চোর। আর খুনি ছিলেন না? ইতালির সিজিসমোন্দো মালাতেসার নাম শুনেছ?

—না। কে তিনি?

—কবি, পণ্ডিত, ললিতকলার উপাসক। মধ্যযুগে তার জন্ম। কিন্তু তার মতো দুর্নীতিপরায়ণ ক্রিমিনাল তুমি কলকাতার কোনও কফিখানা বা বস্তি খুঁজলেও পাবে না। ওসব কথা যাক। আমি এখন কি দেখছি জানো? তাজমহলের স্রষ্টা সাজাহান বাদশার পাঞ্জা।

—'দেখি।' বইখানি হাতে নিয়ে দেখলুম, একখানি ছবিতে ছাপা সম্রাট সাজাহানের ডানহাতের ছাপ।

হেমন্ত বললে, সেকালে মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত মূল্যবান কাগজপত্রের ওপরে সম্রাটের পাঞ্জার ছাপ থাকত। কারণ, মোগলরা জানত, সিলমোহর বা হাতের সই জাল হতে পারে, কিন্তু পাঁচআঙুলসুদ্ধ করতল বা পাঞ্জার ছাপ জাল হওয়া অসম্ভব। পৃথিবীর কোনও দুজন মানুষের পাঞ্জার ছাপ একরকম হতে পারে না। বাংলা পুলিসের স্যার উইলিয়ম হার্সেলসাহেব পৃথিবীতে সর্বপ্রথমে আসামিদের আঙুলের ছাপ নেবার পদ্ধতি গ্রহণ করেন এই সেদিন-১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে। আজ এই পদ্ধতির আদর পৃথিবীর দেশে দেশে। কিন্তু ভারতে এই পদ্ধতির জন্ম বহুকাল আগে। কেবল মোগলদের পাঞ্জার ছাপ নয়, হিন্দুরাও প্রাচীনকাল থেকে দলিলের ওপরে নাম-সইয়ের বদলে আঙুলের টিপ-সই করে আসছে। সুতরাং আধুনিক পুলিশের আবিষ্কারের ভেতর কোনই বাহাদুরি নেই।...

—কিন্তু রবিন, সাজাহান বাদশার পাঞ্জার ছাপ দেখে তোমার কিছু মনে হচ্ছে না?

—হচ্ছে বইকি! মনে হচ্ছে এ হাতের ছাপ দেখলে সাজাহানকে স্মরণ হয় না!

—ঠিক বলেছ। দিল্লী-আগ্রার নানা প্রসাদে, মসজিদে স্মৃতিসৌধের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালে যে শিল্পী সাজাহানের সৌন্দর্যপ্রীতি দেখলে অভিভূত হয়ে যেতে হয়, এই কি তার নিজের হাতের ছাপ? আধুনিক বিশেষজ্ঞরা বলেন, মানুষের আঙুলের গড়ন দেখলে তার প্রকৃতি আর পেশা বোঝা যায়। কিন্তু সাজাহানের আঙুলের গড়ন দেখো! শিল্পীর আঙুলের গড়ন এরকম হওয়া উচিত নয়—যে কোনও সাধারণ লোকের হাতের ছাপা এরকম হতে পারে। বসে বসে এই কথাই ভাবছিলুম।

পুলিশ জার্নালখানা রেখে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আমি বললুম, ভাই, উত্তর দিকের জানলা দুটো বন্ধ করে দি। এই দুর্জয় শীতের ওপরে কাল আবার বৃষ্টি হয়ে ঠান্ডা আরও বেড়ে উঠেছে। চট করে এক পেয়ালা চায়ের হুকুম দাও।

কৌচের উপরে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে হেমন্ত বললে, তা যেন দিচ্ছি! কিন্তু দুর্জয় শীতকে যদি এত ভয়, তবে আজ তুমি গঙ্গাপার হয়ে বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলে কেন?

চমৎকৃত হয়ে বললুম, একথা তুমি কেমন করে জানলে? কেউ বলেছে বুঝি?

—তুমি তো সিধে ওপার থেকে এপারে নেমেই ধুলোপায়ে আমার বাড়িতে আসছ! এর মধ্যে খবর আর কে দেবে? কেমন যা বলছি, সত্যি কি না?

—হ্যাঁ ভাই, সত্যি। কিন্তু আমি কোনও বাগানে বেড়াতে যাইনি! তুমি তো জানো, বেলুড়ে আমার ভগ্নিপতি থাকেন। তাঁর অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলুম। তবে তাঁর বাড়ির সামনে একটা বেশ বড়ো বাগান আছে বটে! কিন্তু এসব কথা তোমার তো জানিবার নয়, তুমি তো কখনও সেখানে যাওনি।

—না, তা যাইনি। কিন্তু তুমি তো একথা জানো বন্ধু, সর্বদা আমার চোখ খোলা রাখি বলে কোথাও না গিয়েও আমি অনেক কথাই বলতে পারি।

আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলুম, কোন সূত্র ধরে হেমন্ত আমার সম্বন্ধে এত কথা জানতে পারলো? নিজের জামার বোতাম ঘরে যে 'কার্নেশন' ফুলটি গুঁজে রেখেছিলুম, হঠাৎ সেইদিকে আমার নজর পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝলুম, হেমন্তের আবিষ্কারের মূল আছে এই ফুলটিতেই।

হেমন্ত অর্ধ মুদ্রিত চোখে আমার ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করছিল! হাসতে হাসতে যেন অন্তর্যামীর মতোই বললে, না, বন্ধু না। তুমি যা ভাবছ, তা নয়! জামার বোতাম-ঘরের ওই ফুলটি তুমি কলকাতার, কোনও বন্ধুর বাড়ি বা ফুলের দোকান থেকেও সংগ্রহ করতে পারতে। ওই দেখেই আমি এত কথা আন্দাজ করিনি। তোমার জুতোর দিকে তাকালেই দেখবে, ওর নিচের দিকটায় লেগে

রয়েছে ভিজে এঁটেলমাটি। ওরকম মাটি কলকাতার কর্দমাক্ত পথেও পাওয়া যায় না! দেখলেই বোঝা যায়, ও হচ্ছে গঙ্গামাটি! জুতো পরে তুমি নিশ্চয়ই স্নান করবার জন্যে গঙ্গাগর্ভে নামো নি। সুতরাং আন্দাজে বুঝলুম, তুমি নৌকোযোগে গঙ্গা পার হয়েছ আর ভাটার সময় বলে নৌকা ছেড়ে নামতে বাধ্য হয়েছ। ঘাট থেকে খানিক দূরে, গঙ্গামাটির ওপরেই। তোমার বোতাম-ঘরের ফুলটি খুব তাজা রয়েছে, সুতরাং বুঝতে পারলুম, ওটি তুমি কলকাতা থেকে সঙ্গে করে ওপারে নিয়ে যাওনি, তাহলে এতক্ষণে ফুলটি অল্পবিস্তর নেতিয়ে পড়ত। অতএব ফুলটিও তুলেছ অল্পক্ষণ আগে, গঙ্গার ওপারে গিয়েই-খুব সম্ভব কলকাতায় ফেরবার সময়। আর বিলাতি মরশুমি ফুল 'কার্নেশন' তো ওপারের পথে-ঘাটে, বনেজঙ্গলে ফোটে না, সুতরাং ধরে নিলুম, ওটি চয়ন করেছ। তুমি কোনও বাগান থেকেই। তোমার জুতোর গঙ্গামাটি এখনও শুকোবার সময় পায়নি। ওই ভিজে মাটি দেখেই বুঝেছি, তুমি নৌকা থেকে নেমেই সিধে আমার বাড়িতে এসে উঠেছা! দেখছ বন্ধু, একটু চেষ্টা করলেই মানুষ দেখে কত কথা আবিষ্কার করা যায়?

আমি বললুম, তুমি আশ্চর্য লোক, হেমন্ত! আমার সঙ্গে অনর্গল গল্প করতে করতে এত খুঁটিনাটি লক্ষ আর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করেছ।

হেমন্ত বললে, সবই অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। আর মানুষের মন আর মুখ এক নয়। সে মুখে যখন এক কথা বলে, তার মন তখন অন্য কথা ভাবতে পারে।

আমি বললুম, কিন্তু চা কই—আমার চা?... এই মধু! জলদি এক কাপ চা নিয়ে আয়!

মধু হচ্ছে হেমন্তের চাকরের নাম।

হেমন্ত বললে, দালানে পায়ের শব্দ শুনছি। যখন খবর না দিয়েই আসছে, নিশ্চয় চেনা লোক।

বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকলেন সতীশবাবু এবং তাঁর পিছনে পিছনে আর একটি ভদ্রলোক-পরনে তাঁর কোট-পেন্টালুন।

—এই যে সতীশবাবু! আসুন, আসুন' বলেই হেমন্ত জিজ্ঞাসুচোখে পিছনের ভদ্রলোকটির দিকে তাকালে।

সতীশবাবু বললেন, ওঁকে চেনেন না বুঝি? উনি হচ্ছেন এ অঞ্চলের বিখ্যাত ডাক্তার মিঃ এ. দত্ত!

—মিঃ এ, দত্ত? অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত? নমস্কার, নমস্কার! সতীশবাবু, উনি তো শুধু ডাক্তার নন, উনি যে রসায়নশাস্ত্র নিয়েও গবেষণা করেন, ইংরেজি কাগজে প্রবন্ধলেখেন! মিঃ দত্ত, এই কালকেই একখানি পত্রিকায় মানুষের দেহের ওপরে Butyl chloride-এর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আপনার একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পড়েছিলুম।

সতীশবাবু বললেন, আপনি এত খবর রাখেন।

মিঃ দত্ত লজ্জিতভাবে বললেন, হেমন্তবাবুর মতো পণ্ডিত লোকের মুখে আমার সুখ্যাতি শুনে আমি গর্ব অনুভব করছি।

হেমন্ত অট্টহাস্য করে বলে, আমি আবার পণ্ডিত নাকি? মোটেই নয়-মোটেই নয়! জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে আমি খালি নুড়ি কুড়েবার চেষ্টা করি! তা, আমার পোড়াকপালে নুড়িও সহজে জোটে না! ওকি, আপনারা এখনও দাঁড়িয়ে রইলেন যে? বসুন, বসুন-ওরে মধু, আরও কাপ-দুয়েক চা আন রে!

সতীশবাবু ও মিঃ দত্ত আসন গ্রহণ করলেন।

এখানে সতীশবাবুর একটুখানি পরিচয় দরকার। সতীশবাবু হচ্ছেন কলকাতা পুলিসের একজন নামকরা ইনস্পেক্টর এবং হেমন্তের সঙ্গে তার আলাপ পরিণত হয়েছে রীতিমতো বন্ধুত্বে। তিনি প্রায়ই এখানে আসেন এবং অপরাধতত্ত্ব নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করে যান। অনেক সাধারণ পুলিসের লোকের মতো নিজেকে তিনি একজন সবজান্তা ও মস্ত বড়ো মনুষ্যরত্ন বলে বিবেচনা করেন না। কোনও জটিল মামলা হাতে পেলে, হেমন্তের সঙ্গে পরামর্শ করতে কুণ্ঠিত হন না একটুও।

চায়ের বারকোস হাতে করে মধু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল।

সতীশবাবু বললেন. হেমেন্দ্রবাবু, লিপটনের 'গ্রীন-লেবেল' চায়ের লোভে আজ আমি এখানে আসিনি। আমি মহাসমস্যায় পড়েছি, তাই এসেছি আপনার কাছে সুপরামর্শ নিতে।

হেমন্ত হাসিমুখে বললে সুপরামর্শ দেওয়া আর দাবা-বোড়ের ওপর-চাল দেওয়া, দুই-ই খুব সহজ। সুতরাং সৃপরামর্শ চেয়ে আপনাকে হতাশ হতে হবে না!

সতীশবাবু চায়ের একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে বললেন, না হেমন্তবাবু, ব্যাপারটাকে আপনি হালকাভাবে নেবেন না। আমার থানার এলাকায় শহরের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি খুন হয়েছেন আর চুরি গিয়েছে আশি হাজার টাকা।

হেমন্ত সোজা হয়ে বসে বললে, কে খুন হয়েছে আর কার টাকা চুরি গিয়েছে?

—হত ব্যক্তির নাম মতিলাল মুখোপাধ্যায়। টাকা চুরি গেছে তাঁরই।

—হাঁ, ও নাম আমি শুনেছি বটে। তিনি তো যদুগোপাল বসু স্ট্রিটে থাকতেন?

—হ্যাঁ। খুনি ধরা পড়েনি।

—কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি?

—সূত্রও পেয়েছি কিছু কিছু, কিন্তু এত এলোমেলো যে, কাজে লাগাতে পারছি না। সন্দেহ করবার মতো লোকও পেয়েছি, তবু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

হেমন্ত আবার কৌচের উপর পা তুলে কুশনের উপরে হেলে পড়ল। তারপর দুই চোখ মুদে ফেলে বললে, তাহলে আগে সব কথা শুনি। মিঃ দত্ত, চোেখ মুদেছি বলে ভাববেন না, আমি ঘুমোবার ফিকিরে আছি। সতীশবাবু আমার অভ্যাস জানেন, চোখ মুদলে আমার শোনবার আর চিন্তার করবার শক্তি দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।

হত্যাকাহিনী

সতীশবাবু বলতে লাগলেনঃ

মতিলাল মুখোপাধ্যায় খুব ধনী লোক। ব্যাঙ্কে তাঁর প্রচুর টাকা জমা আছে, তাছাড়া, কলকাতায় তার বড়ো বড়ো বাড়িও আছে অনেকগুলো।

তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। তিনি নিঃসন্তান। বছর-দুই আগে তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়েছে। মাতিবাবুর এক ভাগ্নে আছেন, তার নাম বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে মতিবাবুর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, ইদানিং তিনি 'ক্রনিক' অজীর্ণ রোগে ভুগছিলেন। তাঁর পরিবারিক চিকিৎসক হচ্ছেন ডাক্তার এ. দত্ত— যিনি আমার সঙ্গে এসেছেন। মিঃ দত্ত কেবল মতিবাবুর চিকিৎসক নন, তাঁর বিশেষ বন্ধুও। মতিবাবু লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে মোটেই ভালোবাসতেন না, এত ধনী হয়েও তাঁর বন্ধুর সংখ্যা তিনচার জনের বেশি নয়। ওদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন মিঃ দত্ত। কোনও কোনও দরকারি বিষয় নিয়ে পরামর্শের দরকার হলে মতিবাবু আগে মিঃ দত্তকে আহবান করতেন।

প্রাচীন বয়সে স্ত্রীর শোকেই হোক বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের জন্যই হোক, কিছুকাল থেকে মতিবাবুকে নানারকম বাতিকে ধরেছিল।

কলকাতার বাড়িগুলো তিনি একে একে বিক্রি করে ফেলেছিলেন। সেই বাড়ি বিক্রির টাকা দিয়ে কিনে রাখছিলেন কোম্পানির কাগজ।

গতকল্য বৈকালেও একখানা বাড়ি বিক্রি করে তিনি আশি হাজার টাকা এনে নিজের শোবার ঘরের সিন্দুকের ভিতরে পুরে রেখেছিলেন। হাজার টাকার আশিখানা নোট।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই মতিবাবুর আর এক খেয়াল হয়েছিল। কিন্তু সেটা বলবার আগে তাঁর বাড়ির কিছু বর্ণনার দরকার।

মাতিবাবুর বসতবাড়িখানা মস্ত বড়ো—তার তিনটে মহল। প্রথম-অর্থাৎ সদর-মহলটা যদুগোপাল বসু স্ট্রিটের উপরেই। সর্বশেষের তৃতীয় মহলের পিছনে আছে কালী বিশ্বাস লেন। সেদিকেও একটা দরজা আছে।

এখন তাঁর খেয়ালের কথা বলি। মতিবাবু আগে থাকতেন প্রথম মহলে, কিন্তু স্ত্রীর পরলোকগমনের পর থেকেই বড়ো রাস্তার ধার ছেড়ে তৃতীয় মহলে এসে বাস করতেন। তিনি অন্য কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন না, যে তিন-চার জন বিশেষ বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন, তারা আসতেন। ওই কালী বিশ্বাস লেন দিয়ে, তৃতীয় মহলে। এদিকেও আলাদা একটা সিঁড়ি আছে।

তৃতীয় মহলে ঢোকবার নিচেকার দরজায় কোনও দ্বারবান থাকে না। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই মতিবাবুর ঘরের সামনে যে বারান্দা বা দালান পাওয়া যায়, সেখানে দিনরাত বাঁধা থাকে প্রকাণ্ড এক মাষ্টিফ কুকুর। তাকে এড়িয়ে মতিবাবুর ঘরে ঢোকবার উপায় নেই। সে কেবল কামড়ায় না, অচেনা লোক দেখলেই বিষম চেঁচিয়ে পাড়া জাগিয়ে তোলে।

বাড়ির প্রথম দুই মহলে বাস করেন মতিবাবুর ভাগিনেয় বিনোদলাল ও অন্যান্য কয়জন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়-তাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক।

মাতুলের সম্পত্তির অল্পবিস্তর তত্ত্বাবধান ছাড়া বিনোদবাবু আর কোনও কাজ করেন না। তবে আমি খবর নিয়ে জেনেছি যে, বিনোদবাবুর ঘোড়দৌড়ের নেশা আছে যথেষ্ট, এবং গোপনে এই নেশায় মেতে তিনি অনেক টাকা নষ্ট করেছেন, ফলে বাজারে তার ধারও সামান্য নয়!

তাঁর মাতুল এসব কথা জানতেন না, কিন্তু কথাগুলো জানতে পারেন আমাদেরই এই মিঃ দত্ত। তিনি এ পরিবারের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, কাজেই সব জেনেশুনেও চুপ করে থাকতে পারলেন না, মতিবাবুর কানে সব কথা তোলেন।

শুনেই তো মতিবাবু মহা খাপ্পা!—একেই তো তিনি বেজায় কড়া লোক, তার উপরে জীবনে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন যারা 'রেস' বা জুয়া খেলে তাদের। তখনই বিনোদলালের তলব হল। মামার কাছ থেকে বিষম বকুনি ও

গলাগলি খেয়ে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, তিনি মাতিবাবুকে দু-এক কথা শুনিয়ে দিলেন। মতিবাবু রেগে অজ্ঞান হয়ে চিৎকার করে বললেন, জুয়াড়িকে আমি আমার সম্পত্তির এক পয়সাও দেব না! আমি নতুন উইল করব।

এই ব্যাপারটা হয়ে গেল কাল দুপুরবেলায়। তারপর মতিবাবু বেরিয়ে অ্যাটর্নিবাড়িতে যান। সেখান থেকে আশি হাজার টাকা নিয়ে বৈকালে ফিরে আসেন।

সন্ধ্যার পর তাঁর শরীর কিছু খারাপ হয়। তিনি একটু সকাল সকালই বিছানায় আশ্রয় নেন এবং শোবার আগে নিজের হাতে ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেন। আপনার জানেন, কাল সন্ধ্যায় অকাল বর্ষা নেমেছিল। বৃষ্টি হয় ঘণ্টাখানেক ধরে।

বৃষ্টি থামে রাতে নটার সময়। বাড়ির নিয়মমতো রাত সাড়ে দশটার সময় দারোয়ান এসে কালী বিশ্বাস লেনের দিকের দরজা বন্ধ করে দিয়ে যায়।

আজ সকালে দেখা যায়, মেঝের উপরে মতিবাবুর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে এবং ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরুবার সব দরজাই বন্ধ।

খবর পেয়ে আমি গিয়ে যা দেখলুম তা হচ্ছে এইঃ

বিনোদলাল বালকের মতো অধীর হয়ে কাঁদছেন। আর মিঃ দত্ত তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন।

মতিবাবুর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে ঠিক খাটের তলায়। তাঁর মুখের উপরে দারুণ যাতনা ও ভয়ের চিহ্ন-সেই সঙ্গে রয়েছে বিষম বিস্ময়েরও আভাস।

তাঁর গলার উপরে একটি নীল দাগ। বিছানার উপরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন। মতিবাবুর দেহের পাশে ছড়ানো রয়েছে একটা ভাঙা কাচের গেলাসের ছোটো-বড়ো টুকরো-কোনও-কোনও কাচ রক্তাক্ত ।

আর একটা আশ্চর্য জিনিসও পেয়েছি। খুব পুরু পশমের একটা দস্তানা!

ঘরের মেঝেতে কাদামাখা জুতোর দাগ আছে—দুরকম জুতোর। কিন্তু কোনও দাগ এত স্পষ্ট বা সম্পূর্ণ নয় যে, নিখুঁত মাপ বা ছাঁচ নেওয়া যেতে পারে। তবে দুজন লোক যে বৃষ্টির পরে এই ঘরের ভিতরে এসেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ঘরের দরজার ঠিক বাইরেই যে একজন লোক দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল, তার একজোড়া জুতোর স্পষ্ট ছাপ দেখেই সেটা অনুমান করা যায়। তার খাঁজকাটা সোলের ছাপ দেখলে আরও বোঝা যায়, সে এসেছিল রবারের জুতো পরে। ঘরের মেঝেতেও এমনি রবারের জুতোর আংশিক ছাপ আছে। সুতরাং বুঝতে দেরি লাগে না যে, প্রথম একজন ঘরে ঢোকবার পরে সেও ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল। দরজার বাইরেকার এই রবারের জুতোর ছাপ আমি নিয়েছি।

মতিবাবুর মৃতদেহ দেখলে মনে হয়, কেউ বা কারা গলা টিপে তাঁকে মেরে ফেলেছে।

তাঁর লোহার সিন্দুক খোলা, মতিবাবুর নিজের চাবি দিয়েই সেটা খোলা হয়েছে। ভিতর থেকে কেবল আশি হাজার টাকার নোটই অদৃশ্য হয়নি। মতিবাবুর টাকা খাটানোর ঝোঁকও ছিল। হ্যান্ডনোটেও তিনি টাকা ধার দিতেন। সিন্দুকের ভিতরে কতকগুলো হ্যান্ডনোটও ছিল, সেগুলো আর নেই। আর পাওয়া যাচ্ছে না মতিবাবুর পকেটবইখানা। তাঁর রোজ ডায়ারি লেখার অভ্যাস ছিল!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হত্যাকারী কে?

খুনি যে বাহির থেকে আসেনি তার প্রমাণ হচ্ছে, প্রথমত, বাড়ির সব বাইরের দরজাই ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। দ্বিতীয়ত, বারান্দায় মাস্টিফ কুকুরটা কোনও সাড়াশব্দ দেয়নি—তার মানে, খুনি তার অচেনা নয়।

বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কথা ছেড়ে দি। পুরুষ আত্মীয় আছে মোট চারজন। বিনোদলাল, একজন প্রায় সত্তর বছরের বুড়ো, একজন বাতে পঙ্গু লোক, আর একটি পনেরো বছরের ছোকরা! বাকি সবাই চাকর-দ্বারবান প্রভৃতি। যদি ধরা যায়, টাকার লোভে তারা মনিবকে খুন করেছে, তাহলেও

একটা প্রশ্ন জাগে। খুনিদের পায়ে জুতো ছিল, চাকর-দ্বারবানরা বাড়ির ভিতরে জুতো পরে না, পরলেও চুপি চুপি কাজ সারবার জন্যে তারা খালি পায়েই আসত। তারা ডায়রি চুরি করত না, আর দস্তানও পরত না।

বাড়ির ভিতর মতিবাবুর মৃত্যুতে লাভবান হবেন কেবল বিনোদলালই। খুনের দিনই তাঁর সঙ্গে মতিবাবুর ঝগড়া হয়েছিল এবং তাঁর মামা তাঁকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন বলে শাসিয়েছিলেন। তাঁর অনেক টাকা ধার, নগদটাকার বিশেষ দরকার। তাকে অনায়াসে সন্দেহ করা যায়। হয়তো তার আহ্বানেই মতিবাবু নিজে ভিতর থেকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন। কুকুর তাঁকে চেনে, তাই চ্যাঁচায়নি।

কিন্তু ঘটনাস্থলে খুনির একজন সঙ্গীও হাজির ছিল। সে লোকটি কে? সমস্ত বাড়ি খুঁজে দেখেছি, রবারের জুতোর সঙ্গে কারুর মাপ মেলে না। রবারের জুতোও বাড়ির কারুর নেই।

হেমন্তবাবু, এই পর্যন্ত আমার কথা। এখন আপনি যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান, করুন। মিঃ দত্তকে সঙ্গে করে এনেছি, তিনি অনেক বিষয়ে আপনার সন্দেহভঞ্জন করতে পারেন, কারণ তিনি হচ্ছেন মতিবাবুর পুরানো বন্ধু!

হেমন্ত চোখ খুলে বললে, লাশ কি শব ব্যবচ্ছেদাগারে চালান করে দিয়েছিলেন?

—না। ইচ্ছে করলে এখনও ঘটনাস্থলেই লাশ দেখতে পারেন।

হেমন্ত গাত্রোত্থান করে বললে, হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। রবিন তুমি এস।

আমি হচ্ছি সাহিত্যিক মানুষ। লাশ-ফাশ দেখলে আমার প্রাণ হাঁসফাস করে, নাড়ি ছাড়ি ছাড়ি! তবু হেমন্তের কথা এড়াতে পারলুম না।

ঘটনাস্থল

আমরা কালী বিশ্বাস লেন দিয়ে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করলুম। হেমন্ত আগে সমস্ত বাড়িখানা ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে দেখলে। তারপর মতিবাবুর শয়নগৃহের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রবারের জুতোর ছাপটা লক্ষ করলে। মাস্টিফ কুকুরটা আমাদের দেখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এবং মাঝে মাঝে গর্জন করতে লাগল।

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলুম মতিবাবুর মৃতদেহটা।

হেমন্ত লাশের পাশে বসে পড়ে বললে মিঃ দত্ত, আপনি তো ডাক্তার। আপনার কি বিশ্বাস? মাতিবাবুকে কেউ কি গলা টিপে মেরে ফেলেছে?

—তাছাড়া আর কি বলি বলুন?

—তাহলে ওঁর গলার ওপরে ওই নীল দাগটা কিসের? ওটা তো আঙুলের দাগ নয়। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন ওটা কোনও স্বচ্ছ ব্যান্ডেজ! আঙুলের দাগ ও-রকম হয় না।

—আমার বোধহয়, আঙুলের দাগ মিলিয়ে গিয়েছে। ওটা কালশিরার দাগ।

—সম্ভব। শব ব্যবচ্ছেদ হবার পরেই টের পাওয়া যাবে। আচ্ছা সতীশবাবু, বাংলাদেশেও শীতকালে কোনও বাঙালি হাতে দস্তানা পরে নাকি?

সতীশবাবু বললেন, আমি তো জানি, পরে না। অন্তত এ বাড়ির কেউ কোনোদিন দস্তানা ব্যবহার করেনি বলেই জেনেছি।

মেঝে থেকে দস্তানটা তুলে নিয়ে হেমন্ত বললে, অতিরিক্ত পুরু সাদা পশমের দস্তানা। এর ওপরেও রক্তের দাগ রয়েছে। হুঁ গেলাস ভাঙা কাচে দস্তানার খানিকটা কেটে গিয়েছে দেখছি। কাচের গেলাসটাও ভাঙা, গোলাসের টুকরোর ওপরে রক্তের দাগ, আশ্চর্য!

সতীশবাবু বললেন, কেন, আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন কি কারণে?

হেমন্ত আগে লাশটাকে একটু তুলে তার তলাটা পরীক্ষা করলে। তারপর বিছানার দিকে তাকিয়ে বললে, এ কাচের গেলাসটা কি মতিবাবুর?

—হাঁ, ঘরে ওই কোনে গেলাসটা কুঁজোর মুখে বসানো থাকত। দেখুন না, কুঁজের মুখ এখন আদুড়।

—বিছানার ওপরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখে বোঝা যাচ্ছে, খুনিদের সঙ্গে মতিবাবু কিছুক্ষণ যুঝেছিলেন। ঘরের আর কোথাও ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। ধরুন, খুনিরা মতিবাবুর গলা টিপে ধরেছে, মাতিবাবু ঝটাপটি করতে করতে মেঝের ওপরে এসে কাবু হয়ে পড়লেন—কিন্তু গেলাসটা ভেঙেছিল তার আগেই, কারণ লাশের পিঠের তলাতেও ভাঙা কাচ রয়েছে.কিন্তু গেলাসটা ভাঙল কেন? আর গেলাসের কাচে খুনির হাতই বা কাঁটল কেন গেলাসটা তো আর হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে পাখির মতো পক্ষ বিস্তার করে কুঁজের মুখ ছেড়ে খুনিদের আক্রমণ করতে আসেনি? যদি বলি, ধস্তাধস্তির সময়ে খুনিদের কারুর হাতে গেলাসটা ছিল, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে গলা টেপার সঙ্গে কাচের গেলাসের সম্পর্ক কি?

সতীশবাবু প্রশংসা-ভরা কণ্ঠে বললেন, ঠিক। হেমন্তবাবু, আপনি একটা মস্ত বড়ো সূত্র আবিষ্কার করেছেন! এ কথা তো এতক্ষণ আমি ভেবে দেখিনি!

হেমন্ত বললে, গেলাসের নিচের দিকটা এখনো অটুট আছে দেখছি। কিন্তু ওর ভিতরটা একেবারে শুকনো। তবু ওটাকে একবার পুলিসের পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। হয়তো ওর মধ্যে কোনও বিষয়ের অস্তিত্ব আছে। ওর গায়ে খুনির আঙুলের ছাপও থাকা সম্ভব।

সতীশবাবু বললেন, হ্যাঁ, সেটা আমিও আগে থাকতেই স্থির করেছি।

—আর, এই দস্তানটা কি আমাকে আজকের মতো ধার দিতে পারেন?

—তা নিন না। কিন্তু কেন?

—আমি দস্তানাটার রক্ত পরীক্ষা করব?

মিঃ দত্ত কৌতুহলী স্বরে বললেন, তাতে কোনও লাভ হবে নাকি?

—হবে বইকি, মিঃ দত্ত। আপনি ডাক্তার, এটা নিশ্চয়ই জানেন যে, medicio legal মতানুসারে মানুষের দেহের রক্তমাত্র চার গ্রুপে বিভক্ত করা যায়। আপাতত আমি পরখ করে দেখতে চাই, দস্তানার রক্ত কোন গ্রুপে বা শ্রেণীতে পড়ে। তাহলে খুনি গ্রেপ্তার হলে অনেকটা নিশ্চিন্তে বলা যেতে পারবে, এ রক্ত তারই দেহ থেকে বেরিয়েছে কি না।

মিঃ দত্ত বললেন, হেমন্তবাবু, আমি জানতুম না যে, এদেশে গোয়েন্দার কাজে কেউ এমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। আপনি অবাক করলেন দেখছি। আজ বড়ো দুঃসময়ে আপনার সঙ্গে দেখা হল, নইলে আরও ভালো করে আলাপ করতুম।

হেমন্ত বিনীতভাবে বললে, আমি খুব রঙিন ফানুস নই মিঃ দত্ত, দয়া করে আমাকে এত বেশি আকাশে তুলবেন না। আর আমার সঙ্গে যদি ভালো করে আলাপ করতে চান, তাহলে অধীন সর্বদাই আপনার দ্বারদেশে হাজির থাকতে রাজি আছে।

মিঃ দত্ত হেমন্তের একখানা হাত ধরে বললেন, দ্বারদেশে নয় হেমন্তবাবু, একেবারে আমার দোতলার ড্রইংরুমে আপনাকে তুলে নিয়ে যেতে চাই। কাল বৈকালেই আমার ওখানে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। কেমন, রাজি তো?

—এ আমার সৌভাগ্য। কিন্তু আপনার ঠিকানা তো আমি জানি না!

—দশ নম্বর পরেশ মিত্র লেন। এখান থেকে ছ-সাত মিনিটের পথ।

সতীশবাবু বললেন, মিঃ দত্ত বেশ লোক যা হোক! আমার পড়লুম বাদ! এক যাত্রায় পৃথক ফল।

মিঃ দত্ত বললেন, নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়! আপনিও যাবেন, রবিনবাবুও যাবেন!

আমার কিন্তু গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। সামনে পড়ে রয়েছে একটা খুন করা মানুষের মৃতদেহ, বাড়ির ভিতর থেকে আসছে আত্মীয়দের বুক চাপা কান্না—এইখানে দাঁড়িয়ে কিনা নিমন্ত্রণের কথা! তারপরেই বুঝলুম, মিঃ দত্ত

হচ্ছেন ডাক্তার—মড়া কেটে কেটে আর লোকের মৃত্যু দেখে দেখে তাঁর মন হয়ে গেছে কঠিন; এবং সতীশবাবু হচ্ছেন, পুলিসের পুরানো লোক-জীবনে বহু নিহত মানুষের ভয়াবহ দেহ ঘেঁটে ঘেঁটে এসব দৃশ্য তাঁর চোখে হয়ে গেছে নেহাত সহজ, সুতরাং তার মনের বিকার না হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন শ্মশানের মুদ্দোফরাসরা—মৃতদেহ ভস্মসাৎ হলে পর তাদের তো চিতার আগুনেই হাঁড়ি চড়িয়ে ভাত রাঁধতে দেখা যায়।

মিঃ দত্ত নিজের হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে ব্যস্ত হয়ে বললেন, সাড়ে আটটা বাজল! সতীশবাবু, আর তো আমার থাকবার উপায় নেই—নটার ভেতরেই আমাকে এক রোগীর বাড়ি যেতে হবে। হেমন্তবাবু, আমাকে কি আর আপনার দরকার আছে?

হেমন্ত বললে, না। মিঃ দত্ত, আপনি অনায়াসেই যেতে পারেন।

মিঃ দত্ত প্রস্থান করলেন। হেমন্ত খানিকক্ষণ লোহার সিন্দুকটা পরীক্ষা করলে। তারপরে বললে, সতীশবাবু, এর চাবি কোথায়?

—চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় খুনির কাছে আছে। একগোছা চাবি। বাড়ির ভেতরের লোকই যে এই খুনের সঙ্গে জড়িত আছে, এও তার আর একটা প্রমাণ। বাইরের খুনি চাবি নিয়ে যাবে কেন? যে চাবি নিয়ে গেছে, নিশ্চয় তার আরও কোনও বদ মতলব আছে।

হেমন্ত কিছু বললে না। নীরবে ঘরের মেঝের একদিকে তাকিয়ে বসে রইল। তারপর উঠে এগিয়ে গিয়ে মেঝের উপর থেকে এক টুকরো শুকনো কাদার মতন কি কুড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ সেটা পরীক্ষা করে বললে, সতীশবাবু, বলুন দেখি এটা কি?

—এক টুকরো শুকনো কাদা।

—হুঁ। ভিজে পথ দিয়ে হাঁটবার সময়ে খুনিদের কারুর জুতোর গোড়ালি আর 'সোলের' খাঁজে এই কাদাটা লেগে গিয়েছিল। তারপর মতিবাবুর সঙ্গে

ধস্তাধস্তি করবার সময়ে কাদার টুকরোটা গোড়ালি আর 'সোলে'র খাঁজ থেকে খসে পড়েছে।

আমি বললুম, তুমি কি করে জানলে যে, ওটা আমাদেরই কারুর জুতো থেকে খসে পড়ে নি?

—দুটি কারণে। প্রথমত, আজ সকাল থেকে শহরের পথ-ঘাট শুকনো খটখটে! এ ঘরে যারা ঢুকেছে। তাদের কারুকেই কর্দমাক্ত পথ দিয়ে হাঁটতে হয়নি। দ্বিতীয়ত, আমি খালি চোখেই যতদূর দেখছি, এই কাদার ভেতরে কিঞ্চিৎ নতুনত্ব আছে।

সতীশবাবু বললেন, খুনিদের একজনের পায়ে ছিল রবারের জুতো। তার গোড়ালি সমতল, সুতরাং এরকম কাদার তাল জমবার উপায় নেই?

—ঠিক! অতএব এটি সংলগ্ন ছিল অন্য খুনির জুতোর সঙ্গে। একে আমি এখন সযত্নে পকেটস্ত করলুম, বাড়িতে গিয়ে অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করব।.সতীশবাবু, একবার বিনোদলালের সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা হবে কি?

—'নিশ্চয়ই হবে!' সতীশবাবুর হুকুমে তখনই একজন লোক বিনোদলালকে খবর দিতে গেল।

খানিক পরে একটি যুবক ভীত হরিণের মতো চারিদিকে তাকাতে তাকাতে অত্যন্ত জড়োসড়ো হয়ে ঘরের ভিতর এসে ঢুকল। ফরসা রং, ছিপছিপে দেহ, মুখ-চোখ সুন্দর। যুবকটি যে খুব শৌখিন, দেখলেই তা বোঝা যায়। কিন্তু তার মাথায় কেয়ারি করা চুল আজ স্নান ও চিরুণির অভাবে এলোমেলো, চাকচিক্যহীন। পরনে দামি রেশমি জামা ও মিহি দেশি কাপড়, কিন্তু সেগুলোও মলিন পারিপাট্যহীন। তার চোখ ফোলা ফোলা, দুই গালেও শুকনো অশ্রুর দাগ-যেন বিয়াোগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যের 'হিরো'!

হেমন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবকের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল—অনেকক্ষণ ধরে। তার চোখদুটো দেখলে মনে হয়, তারা যেন যুবকের মনের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে চাইছে!'

সেই তীব্র দৃষ্টি সইতে না পেরে যুবক মাথা নামিয়ে ঘরের মেঝের দিকে নিজের দৃষ্টি নিবন্ধ করলে। তারপর কম্পিতস্বরে বললে আপনারা কি আমায় ডেকেছেন?

হেমন্ত বললে, 'আপনার নাম কি?' তার স্বরের কঠোরতা দেখে বিস্মিত হলুম।

—শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

—কাল সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আপনি কি করেছেন?

—কাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত আমি থিয়েটারে ছিলুম।

—বাড়ি ফিরেছেন কখন?

—রাত দেড়টার সময়ে।

—মোটরে করে এসেছিলেন?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—কোন থিয়েটারে গিয়েছিলেন?

—নাট্য-নিকেতনে।

—কোন দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছেন?

—সদর দরজা দিয়ে।

—দরজা বন্ধ ছিল?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—কে খুলে দিয়েছিল?

—দারোয়ান।

—কোন জামা পরে থিয়েটারে গিয়েছিলেন?

—যে জামাটা পরে আছি।

—থিয়েটার থেকে আপনি সোজা বাড়িতে এসেছিলেন?

—একটু ইতস্তত করে যুবক বললে, আজ্ঞে, হাঁ।

হেমন্ত ধমকে বলে উঠল, মিথ্যে কথা!

—আজ্ঞে—

—চুপ! থিয়েটার থেকে আপনি বন্ধুবান্ধব নিয়ে হোটেলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে খাবার খেয়েছেন, নেশা করেছেন। আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করবেন না!

বিনোদলালের মুখ হয়ে গেল মড়ার মতো হলদে এবং তার সর্বাঙ্গ। কাঁপতে লাগল থর থর করে।

হেমন্তের কণ্ঠস্বর হঠাৎ আবার অত্যন্ত কোমল হয়ে পড়ল! ধীরে ধীরে সে বললে, বিনোদবাবু, ভবিষ্যতে আর কখনও মদ খাবেন না। মদ হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু—মানুষকে সে যে কোনও মুহূর্তে নরকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। লক্ষ করলে দেখবেন, কোনও পশুও মদ খায় না—কারণ সেটা স্বাভাবিক পানীয় নয়। যে জিনিসে পশুর রুচি নেই, মানুষ যদি তা খায় তাহলে তাকে কি পশুরও অধম বলব না? আর একটা কথা মনে রাখবেন। কোনও ভদ্রলোকেরই মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়। মদ খাওয়া যে পাপ আপনিও তা জানেন। তাই সে পাপ লুকোবার জন্যেই মিথ্যে কথা বলেছিলেন। যে পাপ ভদ্রলোককে মিথ্যে বলতে বাধ্য করে, তার চেয়ে হীন আর কিছুই নেই। এখন আপনি যান, আমি আর কিছু জানতে চাই না।

দারুণ আতঙ্কে একবার হেমন্তের মুখের দিকে তাকিয়েই বিনোদলাল তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সতীশবাবু বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন, হেমন্তবাবু! আপনি যে বিনোদকে চিনতেন। একথা তো একবারও আমাকে বলেননি?

হেমন্ত বললে, চিনতুম মানে? আজ আমি এই প্রথম বিনোদকে দেখলুম, আজ সকালেও এর নাম পর্যন্ত জানতুম না।

প্রায় হতভম্বর মতো মুখ করে সতীশবাবু বললেন, তবে আপনি কেমন করে বিনোদের েএত গুপ্তকথা জানলেন?

—খুব সহজেই! ইচ্ছে, বা চেষ্টা করলে আপনিও জানতে পারতেন! বিনোদ যখন বললে, যে, 'নাট্য নিকেতন' থেকে মোটরে রাত বারোটার সময় বেড়িয়ে বাড়ি ফিরেছে। দেড়টার সময়ে, তখনই বুঝলুম সে সোজা বাড়িতে আসেনি। কারণ, নাট্য নিকেতনের দূরত্ব এখান থেকে এক মাইলের বেশি নয়। মনে প্রশ্ন উঠল, এই দেড় ঘণ্টা সময় সে কোথায় কাটিয়েছে? লক্ষ করে দেখলুম, তার জামার হাতায় তরকারির হলদে দাগ। জামায় পানেরও ছোপ রয়েছে, জায়গায় জায়গায় পোড়া দাগ। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, কাল তার গায়ে ছিল এই জামটাই। তরকারির দাগ দেখে অনুমান করলুম, থিয়েটার থেকে বাড়িতে আসবার আগে সে কোনও হোটেলে গিয়েছিল। কারণ, সাধারণত থিয়েটার দেখে অত রাত্রে কেউ অন্য কোথাও নিমন্ত্রণ রাখতে যায় না। তারপর চিন্তা করে দেখলুম, সিগারেটের আগুনের ফিনকি লেগে জামার নানা জায়গা পুড়ে যাওয়া, তরকারির দাগ আর পানের ছোপ লাগা—এসব হচ্ছে অজ্ঞানতা আর অসাবধানতার লক্ষণ। নেশা না করলে কেউ এমন বেহুঁস হতে পারে না। সেইজন্যেই আন্দাজে বিনোদকে ওইসব প্রশ্ন করেছি!

সতীশবাবু বললেন, অদ্ভুত আপনার তীক্ষ্ণদৃষ্টি! বিনোদকে দেখেই তার আসল চরিত্র আবিষ্কার করে ফেললেন। কিন্তু কাল রাত দশটা পর্যন্ত বিনোদ কি করেছে, একথা আপনি জানতে চাইলেন কেন?

হেমন্ত সহস্যে বললে, এ জিজ্ঞাসার জবাব দেবার সময় এখনো হয়নি, আমাকে দয়া করে মাপ করবেন!

সতীশবাবু অনেকটা যেন নিজের মনে মনেই মৃদুস্বরে বললেন, হাঁ, বিনোদ খালি জুয়াই খেলে না, নেশাও করে! হয়তো তার আরও গুণ আছে!

হেমন্ত বললে, আচ্ছা সতীশবাবু, বিনোদ কাল কখন বাড়িতে ফিরেছে, দারোয়ানের কাছে সে খোঁজ নিয়েছেন কি?

—নিয়েছি। রাত দেড়টার সময়েই।

—উত্তম। আর আমার কিছু দেখবার শোনবার নেই। নমস্কার—

সতীশবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, এখনই যাবেন? কোনও সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছেন কি?

হেমন্ত বললে, এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা আমার পক্ষে উচিত নয়। তবে এইটুকু জেনে রাখুন, ঘনীভূত অন্ধকারের ভেতরে আমি দু-একটি আলোকরেখা দেখতে পেয়েছি বটে। চলে রবিন, পলায়ন করা যাক।

কলকাতায় বিলাতি 'ফগ'

রাস্তায় বেরিয়ে দেখলুম, আজ শহরের এ কী অবস্থা! চারিদিক ঢাকা পড়ে গিয়েছে যেন কুয়াশার ঘেরাটোপে! কলকাতায় যে এমন কুয়াশা হতে পারে, কখনো কল্পনা করিনি!

মুখ তুললে বোঝা যায় না, মাথার উপরে লক্ষ তারার চুমকি বসানো নীলাকাশ বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব আছে। এদিকে-ওদিকে যেদিকে তাকাই-সমস্ত দৃশ্য যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। পুরু ধোঁয়া আর ধোঁয়ার জঠরে। যেখানে যেখানে গ্যাসপোস্ট আছে, সেখানকার কুয়াশা কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে মাত্র, আলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে পদশব্দ শোনা যাচ্ছে কিন্তু পথিকরা অদৃশ্য।

হেমন্ত বললে, ও রবিন, এ হল কি হে! লন্ডনের বিখ্যাত বিলাতি 'ফিগ' কি আমাদের দেশের প্রধান শহরে বেড়াতে এসেছে?

হেমন্ত রয়েছে আমার কাছ থেকে মাত্র এক হাত তফাতে, কিন্তু তাকেও দেখাচ্ছে যেন আবছায়ার মতো!

একে মতিবাবুর বাড়ির পিছন দিককার এই সরু গলিটা সাধারণতই নির্জন, তার উপরে শীতার্তা রাত, এই ভয়াবহ কুজ্ঝাটিকা! মনে হচ্ছে, আমরা চলেছি নিস্তব্ধ এক অন্ধকার রাজ্যের ভিতর দিয়ে অন্ধের মতো!

পিছনে আবার একাধিক অদৃশ্য জুতোর শব্দ হল।

আমি সাড়া দিয়ে বললুম, কে আসে-সাবধান আমাদের দেহের ওপরে হোঁচট খাবেন না!

পরমুহূর্তেই মাথার ওপরে অনুভব করলুম। প্রচণ্ড এক আঘাত এবং চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়ল রাশি রাশি সমুজ্জ্বল সর্ষেফুল এবং তারপরেই হারিয়ে ফেললুম জ্ঞান!

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলুম জানি না। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শুনলুম হেমন্তের কণ্ঠস্বর—রবিন, রবিন!

—অ্যাঁ? কি বলছ? উঃ!

—উঠে বোসে।

হেমন্ত আমাকে ধরে তুলে বসিয়ে বললে, তোমার মাথা ফেটে গেছে। এখনই ব্যান্ডেজ করা দরকার। তাড়াতাড়ি আমার বাড়িতে যেতে পারবে?

—বোধহয় পারব। কিন্তু কে আমাকে আক্রমণ করলে?

—এখন কোনও কথা নয়, আগে বাড়িতে চলো।

...নিজের বাড়িতে ফিরে হেমন্ত আমার ক্ষতস্থানটুকু পরীক্ষা করে বললে, বড়ো বেঁচে গিয়েছ রবিন, আর একটু হলেই আঘাতটা মারাত্মক হয়ে উঠত।

সে তাড়াতাড়ি জল দিয়ে ক্ষতস্থানটা ধুয়ে ঔষধ প্রয়োগ করে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বসল।

—কিন্তু হেমন্ত, হঠাৎ আমার ওপরে গুণ্ডার আক্রমণ কেন?

—গুণ্ডা নয় রবিন, হত্যাকারী!

—হত্যাকারী?

—হ্যাঁ। এ হচ্ছে, মতিবাবুর হত্যাকারীর কীর্তি। খালি তোমাকে নয়, আমাকেও আক্রমণ করেছিল।

—তুমি তাদের দেখতে পেয়েছ?

—আব্ছায়ার মতো দেখেছি। দেখলেও চিনতে পারতুম না, তারা মুখোশ পরে এসেছিল।

—কিন্তু, কেন?

—তারা আমার পকেট থেকে সেই দস্তানাটা চুরি করে পালিয়েছে।

বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলুম। তারপর বললুম, আমার সন্দেহ হচ্ছে, বিনোদের ওপরে। নিশ্চয় সে পাশের ঘরে লুকিয়ে বসে দস্তানা সম্বন্ধে তোমার মতামত শুনেছে।

—তারপর তার কোনও অনুচরের সঙ্গে আমাদের পিছু নিয়েছে।

—হুঁ। আজকের বিদঘুটে কুয়াশা তার পক্ষে একটা মস্ত সুযোগ।

—দুর্যোগও হতে পারে রবিন।

—দুর্যোেগ?

—হ্যাঁ, খানিকটা তাই বইকি!

—মানে?

—'এই দেখো।' হেমন্ত হাসতে হাসতে পকেট থেকে একখানা পকেটবুক বার করে। সামনের টেবিলের উপরে রাখলে!

—পকেটবুক।

—হ্যাঁ। পকেটবুকখানা খুলে দু-একপাতা উলটে সে একটু বিস্মিত স্বরে বললে, না, যা ভেবেছিলুম তা তো নয়।

—কি তুমি ভেবেছিলে?

—ভেবেছিলুম, এর মধ্যে দস্তানা চোরের নামধাম গুপ্তকথা পাব। এখন দেখছি। এখানা হচ্ছে, মাতিবাবুর ডায়ারি!

—অ্যাঁ! তবে কি এইখানই মতিবাবুর ঘর থেকে অদৃশ্য হয়েছে?

—তাই তো বোধ হচ্ছে।

—এখানা তুমি কোত্থেকে পেলে?

—পিক-পকেট যেখান থেকে চিরকালই গুপ্তধন আহরণ করে।

—হেমন্ত, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

—শোনো। কুয়াশায় গা ঢেকে আজ আমাদের একসঙ্গে আক্রমণ করেছিল দুজন লোক। খুব সম্ভব তাদের হাতে ছিল খাটো লোহার ডাণ্ডা। তারা নিশ্চয়ই আমাদের খুন করতে আসেনি, এসেছিল খালি ওই দস্তানাটাই হাতাবার জন্যে। বোধহয় এই দস্তানা কেউ কেউ চেনে, দস্তানাটা দেখলে তারা মালিকের পরিচয় দিতে পারে। কিংবা অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে। কিন্তু সেকথা যাক ... একজন তোমাকে আক্রমণ করে, আর একজন আমার মাথা লক্ষ্য করে ডাণ্ডা মারে, কিন্তু ফসকে যায়। সে আবার ডাণ্ডা তোলবার আগেই আমি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বুকপকেটে অনুভব করি এই ডায়ারিখানার অস্তিত্ব। তুমি জানো রবিন, খুব বিপদেও আমার মাথা গুলিয়ে যায় না। চোখের নিমেষ পড়বার আগেই আমি এক হাতে তাকে জড়িয়ে সাৎ করে তার পকেটে আর এক হাত চালিয়ে ডায়ারিখানা তুলে নিলুম—কিন্তু সেই মুহূর্তে অন্য লোকটা তোমাকে ছেড়ে আমারও মাথায় মারে ডাণ্ডা, আমিও মাটির ওপরে পড়ে যাই। আমার মাথা ফাটেনি বটে, কিন্তু আচ্ছন্নের মতো হয়ে গেলুম। আমাকে সেই অবস্থায় পেয়ে, দস্তানাটা নিয়ে তারা সরে পড়ে। আমি যে পকেট মেরেছি, এটা নিশ্চয়ই তারা জানতে পারে নি।

—চোরের ওপরে আচ্ছা বাটপাড়ি করেছ বটে...কিন্তু হেমন্ত, ডায়ারি আর চাবির গোছা চুরি দেখে সত্যি সত্যিই সন্দেহ হয় যে, বাড়ির ভেতরের কোনও লোকই মতিবাবুকে খুন করেছে। হ্যাঁ, সন্দেহ কেন, একরকম নিশ্চিতভাবেই একথা বলা যায়। বাইরের লোক খুন আর টাকা চুরি করেই তুষ্ট হত-পরে মতিবাবুর চাবির গোছা আর ডায়ারি কোনও কাজেই লগতে পারত না।

ডায়ারির পাতা ওলটাতে ওলটাতে হেমন্ত অন্যমনস্কভাবে বললে, হ্যা, সতীশবাবুরও ওই মত।

মিনিট পাঁচ-ছয় হেমন্ত ডায়ারি থেকে আর মুখ তুললে না। তারপর হঠাৎ উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, পেয়েছি। রবিন, ডায়ারি চুরির কারণ পেয়েছি! এই

পাতাখানা ছাড়া ডায়ারির অন্য কোথাও আমাদের পক্ষে বিশেষ কোনও দরকারি কথা নেই। শোনো—' বলেই পড়তে লাগল:

—'আমার শোবার ঘরের বড়ো টেবিলের ডানদিকের টানার পিছনের কাঠে একটি গুপ্তস্থান আছে। বাঁ কোনের শেষপ্রান্তে খুব ছোটো একটি স্প্রিং আছে। সেটি টিপলেই গুপ্ত স্থানটি বেরিয়ে পড়বে। ওর মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার হিরা, চুনি, পান্না আর মুক্তা আছে। বৃদ্ধ হয়েছি, স্বাস্থ্য দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে, হঠাৎ যদি মারা পড়ি সেই ভয়ে আমার উত্তরাধিকারীর জন্যে এখানে এই কথাগুলি লিখে রাখলুম।'

—রবিন, খুনি জানত যে, ডায়ারির মধ্যে এই গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাবে!

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, তাহলে এই খুনি নিশ্চয়ই বাড়ির ভিতরের লোক। এইজন্যেই সে চাবি চুরি করেছে! কাল তাড়াতাড়িতে ডায়ারি পড়তে পারেনি, খুব শীঘ্রই সে কাজ হাসিল করবে!

—'করবে নাকি? দেখা যাক!' বলেই হেমন্ত উঠে 'টেলিফোনে'-র 'রিসিভার' তুলে নিয়ে থানার নম্বর বললে।

—কে? সতীশবাবু? থানায় ফিরে এসেছেন? হাঁ, আমি হেমন্ত। শুনুন। মতিবাবুর দেহ শব-ব্যবচ্ছেদ্যাগারে পাঠিয়ে দিয়েছেন তো? বেশ। তার শোবার ঘর বন্ধ আছে? উত্তম। কিন্তু একটা জরুরি কথা মনে রাখবেন। ও ঘরের দরজার সামনে সর্বদাই যেন পাহারা রাখা হয়—কেউ যেন কোনও কারণেই ও ঘরে ঢুকতে না পায়। কেন? কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এখনো প্রকাশ করবার সময় হয়নি। রাগ করবেন না, যথাসময়ে সমস্তই বলব!..

...বলেন কি? যে কনস্টেবল ভাঙা কাচের গেলাস নিয়ে একলা আসছিল, হঠাৎ পথে কারা তাকে আক্রমণ করেছে? তারপর? গেলাসটা ছিনিয়ে নিতে পারেনি? শুনে সুখী হলুম। কনস্টেবল কারুকে চিনতে পারেনি? হাঁ, কলকাতার

আজকের কুয়াশাটা আশ্চর্য বটে। অভূতপূর্ব কি বললেন? মিনিট দুয়েক আগেই গলির মোড়ের কাছে কনস্টেবল আর এক পথিকের গায়ের ওপরে গিয়ে পড়ে? কে সে? বিনোদ? অত কুয়াশায় ওখানে সে কি করছিল? মাথা ধরেছে বলে বেড়াতে বেরিয়েছিল? এই বিশ্রী কুয়াশায়? আশ্চর্য ওজর তো! তাকে গ্রেপ্তার করবেন কি না ভাবছেন? আপনার কর্তব্য আপনিই ভালো বোঝেন, আমি আর কি বলব? এ পথে আমি শিক্ষানবিস ছাড়া তো আর কিছুই নাই!...হাঁ, আমার কাছেও একটা নতুন খবর আছে। আমাকে আর রবিনকেও আজ কারা আক্রমণ করেছিল। রবিনের মাথা ফেটে গেছে। বেচারি! আমার খুব বেশি লাগেনি বটে, কিন্তু সেই দস্তানাটা লুট হয়ে গেছে—কনস্টেবলের মতো আমার ভাগ্যও ভালো নয়। না, চিনতে পারিনি। একে কুয়াশা, তার ওপরে উপন্যাসের দুরাত্মাদের মতো তারা মুখোশ পরে এসেছিল। না, না, এত রাত্রে আমাদের আর দেখতে আসতে হবে না, আমরা ভালোই আছি। আচ্ছা নমস্কার।' আমার দিকে ফিরে সে বললে, 'রবিন, সব শুনলে তো?'

অভিভূত কণ্ঠে বললুম, ভাই হেমন্ত, এ যে আমরা সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়েছি। কাল খুন, আশি হাজার টাকা চুরি, আজ আমাদের আর কনস্টেবলকে আক্রমণ! আমি ভাই কালি-কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করি, এত গোলমাল আমার ধাতে সহ্য হবে না তো!

হেমন্ত বললে, হাঁ, আমিও জানতুম, বটতলার ডিটেকটিভ নভেলেই এমন সব হই হই কাণ্ড ঘটতে পারে!..কিন্তু রবিন, বুঝতে পারছ কি, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো সরাবার জন্যে খুনিরা কি রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে! উপন্যাসকেও সত্য করে তুলতে চাইছে? কিন্তু কে তারা—কে তারা? কিছুই ধরতে পারছি না যে!

আমি বললুম, আচ্ছা, সতীশবাবুর কাছে তুমি একটা কথা ভাঙলে না কেন?

দুষ্টুমি ভরা হাসি হাসতে হাসতে হেমন্ত বললে, কি কথা?

— মতিবাবুর ডায়ারির কথা?

হেমন্ত হঠাৎ গভীর হয়ে বললে, রবিন, আমার এ লুকোচুরি মার্জনীয়। সত্যি কথা বলতে কি, এইটেই হবে আমার জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য 'কেস'। পুলিসের কাছে এর সমস্ত বাহাদুরিটা আমি একলাই অর্জন করতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি এ মামলাটার কিনারা করতে পারব। অবশ্য, তারপরে আমি সরে দাঁড়াব যবনিকার অন্তরালে জনসাধারণের কাছ থেকে পুলিসকে ষোলো আনা সুখ্যাতি আদায় করবার অবসর দিয়ে।

—কিন্তু এ আগুন নিয়ে খেলা হচ্ছে, আমাদের প্রাণ যেতেও পারে।

—দেহের ভিতর থেকে এত চটপট প্রাণবায়ু যাতে বহির্গত না হয় সে চেষ্টার ত্রুটি আমি করব না। কিন্তু...কি আশ্চর্য, আমি যে একটা বড়ো কথা ভুলে গিয়েছি। রবিন!' বলেই হেমন্ত টপ করে দাঁড়িয়ে উঠে নিজের পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে দিলে।

—কি খুঁজছ তুমি?

—'এইটে'। হেমন্ত বার করলে সেই কাগজের মোড়কটা-যার ভিতরে সে পুরে রেখেছিল খুনির জুতো থেকে খসা খানিকটা শুকনো কাদা।

মোড়কটা খুলে হেমন্ত আশ্বস্ত স্বরে বললে, আঃ, বাঁচা গেল; কাদার টুকরোটা ধস্তাধস্তিতে গুড়িয়ে গেছে বটে, কিন্তু হারিয়ে যায়নি!

আমি বললুম, ওই এক টুকরো কাদাকে তুমি এমন অমূল্য নিধি বলে ভাবছ কেন? ওর ভেতর থেকে তুমি কি খুনিকে আবিষ্কার করতে চাও?

—আশ্চর্য কি? আমার সঙ্গে পরীক্ষাগারে এস।

হেমন্ত তার পরীক্ষাগারে গিয়ে টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। তারপর অণুবীক্ষণ ও সেই মোড়কের শুকনো কাদার গুড়ো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

এরকম পরীক্ষার মধ্যে আমি কিছু রস-কস পাই না। ঘরের এক কোণে মাটি দিয়ে তৈরি একটি গায়ের ছাল ছাড়ানো মানুষ-মূর্তি দাঁড় করানো ছিল—

আমি তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম। শিল্পী কেবল মূর্তিই গড়েনি, স্বাভাবিক সব রং বুলিয়ে, নরদেহের ত্বকের তলায় যে সমস্ত বিশেষত্ব থাকে, তার প্রত্যেকটিই ফুটিয়ে তুলেছে। এসব দেখলে বেশ বোঝা যায়, পঞ্চভুত দিয়ে আমাদের দেহ তৈরি করতে বসে প্রকৃতিদেবীকে কত মাথা খাটাতে, কত শিল্পচাতুরী প্রকাশ করতে হয়েছে। আশ্চর্য ও রহস্যময় হচ্ছে মানুষের দেহের ভিতরটা!

এমন সময় হেমন্ত আমাকে ডেকে বললে, এই শুকনো কাদার ভেতরে কি কি আছে, জানো?

জানবার জন্যে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তবু বললুম, কি কি আছে?

—এর মধ্যে আছে চুন আর বালি, সুরকি আর কয়লার গুড়ো। এগুলো মেশানো আছে কলকাতার পথের সাধারণ ধুলোর সঙ্গে।

আমি বললুম, চুণ, বালি, সুরকি আর কয়লাও মেলে কলকাতায় যেখানে সেখানে। এর কোনটাকেই আমি অসাধারণ বলে মনে করি না।

—'কর না নাকি? ও!' এই বলেই হেমন্ত একেবারে চুপ মেরে গেল। তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, অত্যন্ত একমনে সে যেন কোন মহা দরকারি কথা চিন্তা করছে।

খানিক পরে আমি বললুম, দেখো ভায়া, এটা ভারী বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু। শুকনো কাদার গুড়ো, অর্থাৎ ধুলো নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামানো হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কের অপব্যবহার!

হেমন্ত আমার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অন্যমনস্কের মতো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, প্রিয় রবীন, তুমি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড উজবুগ!

দ্রবীভূত বাতাস

পরদিন বৈকালে চললুম। পরেশ মিত্র লেনে, মিঃ দত্তের চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে। বিশেষ করে, কলকাতার উত্তর অঞ্চলে শহরের শিরা-উপশিরার মতো যেসব ছোটো ছোটো গলি দেখা যায়, পরেশ মিত্র লেনও হচ্ছে ঠিক সেইরকম। গলিটি চওড়ায় ছয়-সাত হাতের বেশি নয়, সাপের মতো এঁকেবেঁকে পাক খেয়ে ভিতর দিকে চলে গিয়েছে।

গলিটা প্রথম যেখানে মোড় ফিরেছে, সেখানে বড়ো রাস্তা থেকে দেখা গেল, একখানা নতুন বাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে।

একটা জিনিস। আমি বরাবরই লক্ষ করেছি, ছেলেবেলা থেকেই সর্ববিষয়েই হেমন্তের কৌতুহল হচ্ছে অসীম। হয়তো এটা ভালো ডিটেকটিভের একটা বিশেষ লক্ষণ, কিন্তু ঠিক এই কারণেই তার সঙ্গে পথ চলা অনেক সময়ে কেবল বিরক্তিকরই নয়, নিরাপদও ছিল না।

একদিনের কথা বলি।

বাগবাজার দিয়ে যাচ্ছি আমরা দুইজনে। রাস্তায় একটা বিড়িওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে কে হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল হেমন্ত। তিন, চার, ছয় মিনিট কেটে গেল, সেখান থেকে সে আর নড়বার নাম করে না।

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম, কি হে, ব্যাপার কি? এই দুপুর রোদে মাথার চাঁদি গরম হয়ে উঠল যে, আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে?

হেমন্ত আমাকে একটু তফাতে টেনে এনে বললে, রবিন, তুমি ওর দাঁত লক্ষ করেছ?

—দাঁত! কার দাঁত?

—ওই যে লুঙ্গিপরা লোকটা এখনই হা হা করে হেসে উঠল? দেখো দেখো, আবার ও হাসছে। ওরা দাঁত দেখো!

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'যাও যাও, বাজে বোকো না। পথে পথে লোকের দাঁত দেখে বেড়ানো আমার ব্যবসা নয়, চলো!' বলেই তার হাত ধরে টান মারলুম।

কিন্তু হেমন্তকে এক ইঞ্চি নড়াতে পারলুম না। সে বললে, 'ওর শ্বদন্তগুলো কি রকম অসম্ভব বড়ো আর লম্বা দেখেছ?

—শ্বদন্ত? শ্বদন্ত আবার কি?

—মুর্খ রবিন, তুমি সাহিত্যচর্চা ছেড়ে দাও! তুমি ভালো গোয়েন্দা বা সাহিত্যিক কিছুই হতে পারবে না। মাতৃভাষা জানো না? শ্বদন্ত, অর্থাৎ canine tooth!

—সাহিত্যিকের কাজ নয় শ্বদন্ত নিয়ে তদন্ত করা। চলে এস।

—অসাধারণ ওর শ্বদন্ত। তার ওপরে ও আবার চৌকো চোয়ালের অধিকারী। যেসব বড়ো বড়ো পণ্ডিত অপরাধবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন, তারা বলেন যে—

—তাঁরা কি বলেন, আমি শুনতে চাই না। এখন আগে আসবে কি না বলো!

—উহু, এখন আমি যাব কোথায়? আমি আগে ও লোকটার পরিচয় জানতে চাই!...ওই দেখো, লোকটা এগিয়ে চলল! মস্ত বড়ো লম্বা শ্বদন্ত, তার ওপরে চৌকো চোয়াল-সোনায় সোহাগা! এস রবিন, আমরাও ওর পিছনে পিছনে অগ্রসর হই!' হেমন্ত এমন বজ্রমুষ্টিতে আমার হাতের কবজি চেপে ধরল যে, তার হাত ছাড়ানো অসম্ভব।

বাগবাজারের মোড়ে এসে লোকটা চড়ল চিৎপুর রোডের বাসে। আমরাও বাসে চেপে কিনলুম টিকিট।

আমি চুপি চুপি বললুম, এ যে, বুনো হাঁসের পিছনে ছোটা হচ্ছে! ওর পরিচয় জেনে আমাদের কি লাভ?

—লাভ হয়তো কিছুই হবে না, হতাশ মুখে ফেরার সম্ভাবনাই প্রবল! কিন্তু আমি হচ্ছি অপরাধ বিজ্ঞানের ছাত্র! বিজ্ঞানের মতামতগুলো মেকি কি না, যাচাই করবার চেষ্টা করব না?

মনে মনে হেমন্তের অপরাধ বিজ্ঞানকে পাঠাতে চাইলুম জাহান্নামে। মশাই, কি আপদ। বলুন তো! চৈত্রমাসের তপ্ত দুপুর, পথের কুকুরগুলোও এখন ধুকতে ধুকতে ঠান্ডা আশ্রয় খুঁজছে! কোথায় বাড়িতে গিয়ে খেয়েদেয়ে, ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করে বিজলি-পাখার তলায় শীতলপাটি বিছিয়ে বসে বরফ দেওয়া শরবত পান করতে করতে রবিঠাকুরের কবিতা পড়ব, না ছুটে চলেছি। এক মহাপাগলের সঙ্গে কোনও শ্বদন্ত ও চৌকো চোয়ালের পিছনে! গ্রহের ফের আর কাকে বলে?

হতচ্ছাড়া শ্বদন্ত বাস থেকে নামল হ্যারিসন রোডের মোড়ে। তারপর খানিক এগিয়ে একটা কফিখানায় গিয়ে ঢুকল।

হেমন্ত রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বললে, লোকটার পরিচয় এখনো জানা হল না তো! আমরাও কফিখানার খরিদ্দার হব নাকি?

—ভাই হেমন্ত, এইবার দয়া করে আমাকে মুক্তি দাও! তোমার শ্বদন্তের নাম-ধাম বংশ পরিচয় তো আমার কাছে নেই, আমি অপরাধবিজ্ঞানের ছাত্রও নই। আমাকে নিয়ে আর টানাটানি কর কেন?

হেমন্ত মাথা চুলকোঁতে চুলকোতে ভাবছে, অতপর কি করা কর্তব্য, এমন সময় বড়োবাজার থানার এক ইনস্পেক্টর সেখানে এসে হাজির হলেন।

—আরে, আরে, হেমন্তবাবু যে! এমন অসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছেন কেন?

হেমন্ত কফিখানার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, ওই লোকটাকে দেখছি! ওই যে, পুরনো ডোরাকটা সবজে লুঙ্গি গায়েও ডোরাকাটা লাল গেঞ্জি, বসে বসে গোগ্রাসে মাংস গিলছে।

ইনস্পেক্টর প্রায় মিনিটখানেক ধরে ভালো করে লোকটাকে দেখলেন, তারপর সবিস্ময়ে বললেন, ব্যাটার সাহস তো কম নয়! দিনের বেলায় এখানে প্রকাশ্যে বসেই ফুর্তি করে খাবার খাচ্ছে! ধন্যবাদ হেমন্তবাবু, ওকে দেখিয়ে দিয়ে ভারী উপকার করলেন!

—কে ও?

—আবদুল মিয়া, মেছোবাজারের গুণ্ডা, দাগি আসামি, সাতবার জেল খেটেছে! আজ তিনদিন ধরে একটা খুনের মামলায় ওকে আমরা সারা কলকাতাময় খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর ও কিনা আমাদের হাতের কাছেই খোসমেজাজে সশরীরে বর্তমান।

আবদুল তখনই ধরা পড়ল! হেমন্তের দুই চোখ যেন নাচতে লাগল। বাড়ি ফেরবার জন্যে একখানা ট্যাক্সি ডেকে বললে, ভায়া হে, অপরাধবিজ্ঞানের মাহাত্মটা দেখলে তো?

...পরেশ মিত্র লেনের সেই প্রায় সম্পূর্ণ বাড়িখানা হঠাৎ হেমন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। মিনিট দুয়েক ধরে বাড়িখানা দেখে সে বললে, দেখো রবিন, আজ কিছুকাল থেকে বাংলাদেশে নতুন এক উৎপাত শুরু হয়েছে। 'স্কাইসক্রেপার' নামে এক অদ্ভুত—এমন কি, বেয়াড়া ধরনের বাড়ি আমরা আমেরিকায় দেখে এসেছি। আমেরিকার বায়স্কোপওয়ালারা এই কনারক 'মন্দির' আর 'তাজমহলের' দেশে এসেও সেই ঢঙে 'মেট্রো' সিনেমার বাড়ি তৈরী করেছে! সেটা আমাদের চোখকে আঘাত দিলেও 'মেট্রোর' কর্তৃপক্ষকে দোষ দিতে চাই না। কারণ, তারা হচ্ছে সেই দেশের লোক, যারা বিদেশের ঠাকুর ফেলে, স্বদেশের কুকুর ধরে আদর করে মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। কিন্তু আজকাল বাঙালিরাও দেখছি কলকাতার পথে পথে স্কাইসক্রেপরের নকলে ঘরবাড়ি তৈরি করতে

লজ্জিত হয় না। এই নতুন বাড়িখানার দিকে চেয়ে দেখো। এই বিদেশি আদর্শের বদহজম সহ্য করা অসম্ভব। এমন অনুকরণপ্রিয় জাতি কোনোদিনই স্বাধীন হতে পারবে না।

বিরক্ত চোখে হেমন্ত আরও কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললুম, তোমার স্থাপত্যের সমালোচনা রেখে এখন দশ নম্বরের বাড়ি খোঁজো। পাঁচটা বাজে যে, চায়ের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়!

—যাক গে উত্তীর্ণ হয়ে! এও অনুকরণ! আমরা কি ইংরেজ যে এই সময়ের মধ্যে আমাদেরও চা খেতে হবে?

—এস, এস, ওসব নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে! মিঃ দত্ত হয়তো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন!

কিছুদূর এগিয়েই দশ নম্বরের বাড়ি পাওয়া গেল। দ্বারবানের উপরে বাে◌ধহয় আদেশ ছিল আমাদের নাম শুনেই সে দোতলায় যেতে অনুরোধ করলে।

মিঃ দত্ত তার দোতলার বৈঠকখানায় বসে সত্য মতোই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দেখলুম, সতীশবাবু আমাদের আগেই সেখানে এসে হাজির হয়েছেন।

মিঃ দত্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, হেমন্তবাবু, রবিনবাবু! কাল আপনারা কি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিলেন, সতীশবাবুর মুখে তা শুনে স্তম্ভিত হয়েছি। রবীনবাবুর মাথায় এখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে যে! নিশ্চয় ওঁর খুব লেগেছে।

আমি বললুম, লাগেনি বললে মিথ্যা বলা হবে। মধু খেলে মিষ্টি লাগে, ডাণ্ডা খেলে কষ্ট পেতে হয়। প্রকৃতির এই-ই স্বাভাবিক নিয়ম।

মিঃ দত্ত বললেন, কিন্তু, কে এই পাপিষ্ঠ? অনায়াসে যে খুন করছে, ভদ্রলোককে মারাত্মক আক্রমণ করছে, অথচ এখনও মেঘনাদের মতো লুকিয়ে আছে মেঘের আড়ালে? আমার তো মশাই, বাড়ি থেকে আর বেরুতে ভয় করছে!

সতীশবাবু বললেন, আপনার আবার কিসের ভয়? আপনি তো পুলিসের লোক নন?

—আমি পুলিসের লোক নই বটে, কিন্তু বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে পুলিসকে তো সাহায্য করছি? খুনিদের রাগ আমার ওপরে পড়তে কতক্ষণ!

সতীশবাবু বললেন, ভয় নেই। মিঃ দত্ত, আমরা বোধহয় শীঘ্রই খুনিকে ধরতে পারব। আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারেন?

—আজ্ঞা করুন।

—আজ্ঞা নয়। মিঃ দত্ত, অনুরোধ। আপনি তো মতিবাবুর বন্ধু, ও পরিবারের অনেক খবরই রাখেন। বিনোদলালবাবু কোন কোন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেন, সে বিষয়ে আমাদের কোনও খবর দিতে পারেন?

মিঃ দত্ত বিরক্তভাবে মাথা নেড়ে বললেন, বিনোদের বন্ধুদের কথা আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না!

—কেন বলুন দেখি?

—তারা লোক ভালো নয়! তাদের বিশেষ পরিচয় আমি জানি না বটে, কানাঘুসোয় শুনেছি, বন্ধুদের চেষ্টাতেই বিনোদের পরকাল ঝরঝর হয়ে যাচ্ছে! বন্ধুরা চেষ্টা করবে না কেন? মামার মৃত্যুর পরে বিনোদ হবে অগাধ সম্পত্তির মালিক, তারপরেই তো তাদের পোয়াবারো! কিন্তু যেতে দিন মশাই, ওকথা যেতে দিন!

হেমন্ত বললে, সতীশবাবু, শব ব্যবচ্ছেদ্যাগারের খবর কি?

— মতিবাবুর পাকস্থলীতে কোনোরকম বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, যদিও ডাক্তারদের আগে সেই সন্দেহই হয়েছিল। মতিবাবুকে কেউ গলা টিপে মেরে ফেলেছে কিনা, ডাক্তাররা জোর করে সেকথাও বলতে পারছেন না, তবে তার স্বীকার করছেন যে, ওটা মৃত্যুর কারণ হলেও হতে পারে। মতিবাবুর কণ্ঠের প্রত্যেক রক্তবহা নাড়িতে অতিশয় রক্তাধিক্যের লক্ষণ পাওয়া গেছে। নিশ্চয়ই

বিষম জোরে তাঁর গলা টিপে ধরা হয়েছিল। ডাক্তারের রিপোর্ট তো এই, আপনার রিপোর্ট কি হেমন্তবাবু?

—আমার রিপোর্ট? আপাতত আমার কাছে রিপোর্ট করবার মতন কোনও তথ্যই নেই।

আমি উপহাসের স্বরে বললুম, কেন হেমন্ত, তুমি তো অনায়াসেই তোমার সেই মহামূল্যবান শুকনো কর্দমা চুর্ণের কাহিনী বলতে পারো?

সতীশবাবু আগ্রহভরে বললেন, দাোহাই হেমন্তবাবু, আপনার এই কর্দমা চুর্ণের কাহিনী থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

আমার দিকে একবার রেগে কটমট করে তাকিয়ে হেমন্ত বললে, না সতীশবাবু, শোনেন কেন, এসব বিষয়ে আমার বন্ধুটি হচ্ছে পয়লা নম্বরের অপদার্থ। যে ধুলোকে আমরা রাখি, পায়ের তলায়, আধুনিক অপরাধবিজ্ঞানে তার স্থান যে কত ওপরে, মুর্খ রবিন সেকথা জানে না।

কিন্তু দত্ত কৌতুহলী কণ্ঠে বললেন, হেমন্তবাবু, এসব বিষয়ে আমিও কম কাঁচা নাই। আপনার মুখে একটুখানি ধুলোর ইতিহাস শুনতে চাই! ততক্ষণ বেয়ারারাও চা-টা নিয়ে আসবে।

হেমন্ত বললেন, দেখুন, কিছুকাল আগেও অপরাধের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিল না বিশেষ কিছুই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চুরি আর খুনের মামলার তদন্ত আরম্ভ হয়েছে খুব একালেই। আগে কোনও লোকের উপর সন্দেহ হলে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করবার জন্য তাকে দেওয়া হত অমানুষিক যন্ত্রণা। তার ফলে কেউ কেউ মারা পড়ত এবং অনেকে প্রাণের ভয়ে নির্দোষ হলেও মিথ্যা বলে অপরাধ স্বীকার করত। ইউরোপে এমন সব ঘটনাও ঘটেছে, পুলিস সন্দেহ করে একজনকে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলেছে, তারপর প্রকাশ পেয়েছে, সত্যিকার অপরাধী হচ্ছে আর একজন লোক। আসল কথা, আগে অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশের বুদ্ধির জোরে নয়, যন্ত্রণার চোটেই আসামির অপরাধ প্রকাশ পেত।

কিন্তু আজকের ধারা ভিন্ন রকম। একালে পুলিস যদি যন্ত্রণা দিয়েও আসামিকে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করে, তাহলে আদালতে তা গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু ইউরোপের আধুনিক পুলিসকে যন্ত্রণার দ্বারা অপরাধীকে দোষ আবিষ্কার করতে হয় না। তার কারণ, পুলিস এখন বিজ্ঞানের সাহায্য পায়। অপরাধীর স্বীকার অস্বীকার নিয়ে পুলিস মাথা ঘামায় না, ঘটনাস্থলে পাওয়া আসামির ব্যবহার করা কাপড়, জামা, জুতো, টুপি, লাঠি, ছাোরা-ছুরি প্রভৃতি অনেক রকম জিনিসের ভেতর থেকে পুলিস বিজ্ঞানের সাহায্যে আশ্চর্য সব তথ্য আবিষ্কার করতে পারে। আসামি অপরাধ স্বীকার করলেও দণ্ড থেকে মুক্তি পায় না। এ বিষয়ে নানাদিকে নানা কথা বলা যায়, কিন্তু আপাতত বলতে চাই কেবল ধুলোর কথা।

আপনারা সকলেই নিশ্চয় জানেন যে, ধুলোর অগম্য ঠাঁই নেই। জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে একটা বাক্সে ঢাকনি দেওয়া কৌটা রেখে দিন, তার মধ্যেও ধুলো ঢুকবে। সাধারণ চোখে সে ধুলো যদি দেখতে না পাওয়া যায়, তবে অণুবীক্ষণ ব্যবহার করুন-দেখবেন, কৌটার ভেতরে বাস করছে নানারকম ধুলো। এক এক শ্রেণীর মানুষ যে কোনও জিনিস নিয়ে নিয়মিতভাবে নাড়াচাড়া করবে, তার মধ্যে বিশেষ করে পাওয়া যাবে। এক এক শ্রেণীর ধুলো! জার্মানি, অস্ট্রিয়া, আর ফ্রান্সের পুলিসরা এ বিষয় নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছে। অপরাধীদের ব্যবহৃত জিনিসগুলো হচ্ছে তাদের কাছে নাম-সই করা স্বীকার-উক্তির চেয়েও মূল্যবান।

যারা পাউরুটি তৈরি করে, তাদের নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায়। গমের পালো বা শ্বেতসার। যাদের কাজ ধাতু নিয়ে, তাদের জিনিসে মেলে অতি সূক্ষ্ম ধাতব ধুলো। খনিতে যারা থাকে, তাদের ব্যবহৃত জিনিসে থাকে খনিজ ধুলো। রাস্তায় যার পাথর ভাঙে তাদের জিনিসে থাকে খনিজ ধুলো। রাস্তায় যারা পাথর ভাঙে তাদের জিনিস সূক্ষ্ম বালুময় ধুলোতে ভরা। এইরকম নানারকম জিনিস অনুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করে অনায়াসে বলে দেওয়া যায়, তাদের মালিক মিস্ত্রী, ছুতোয়, কশাই, মুচি বা অন্য কোনও শ্রেণীর লোক।

প্রফেসর সেভেরিন ইকার্ড নানা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করেছেন, নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত ট্যাঁকঘড়ি বা হাতঘড়ির ভেতরে যে ধুলো জমে, তার সাহায্যে খুব সহজেই বলে দেওয়া চলে, কোন শ্রেণীর লোক হচ্ছে ঘড়ির মালিক। এইবার একটা সত্য গল্প বলি:

বিলাতের এক পাড়াগাঁয়ে একবার একটি স্ত্রীলোককে কে খুন করে পালায়। স্ত্রীলোকটির দেহে ছুরির আঘাত ছিল বটে, কিন্তু সে আঘাতই তার মৃত্যুর কারণ নয়। লাল ও নীল রেশমি সুতোয় পাকানো দাঁড়ার ফাঁস তার গলায় লাগিয়ে কেউ তাকে হত্যা করে পথের ধারে ফেলে পালিয়ে গেছে।

পুলিস দস্তুরমতো বৈজ্ঞানিক প্রথায় তদন্ত শুরু করলে। হত স্ত্রীলোকটির পোশাকে পাওয়া গেল তামাকের ধুলো, অর্থাৎ নস্য; তার জামাকাপড়ের কোনও কোনও জায়গায় কয়লা গুড়োও দেখা গেল। তারও ওপরে আবিষ্কৃত হল অভ্র, silicate of calcium আর magnesium প্রভৃতি খনিজ পদার্থের ধুলো।

কিছুদিন পরে পুলিস সন্দেহক্রমে একটা লোককে গ্রেপ্তার করলে। অণুবীক্ষণ দিয়ে তার আঙুলের নখের ফাঁকে দেখা ওইসব অভ্র, কয়লা আর অন্যান্য পদার্থের অতি সূক্ষ্ম ধুলো এবং—সবচেয়ে যা সন্দেহজনক-লাল-নীল রেশমি সুতোর টুকরো! জানা গেল, সে নস্য নেয়! তার পকেটে একখানা ছুরি ছিল, তাতেও রয়েছে অস্পষ্ট রক্তের ছাপ। ।

আসামি বললে, 'সে গ্যাসের কারখানায় আর খনিতে ঠিকে কাজ করে। সে কারখানা আর খনির ঠিকানাও দিলে। কিন্তু তার নখের ফাঁকে সেসব খনিজ পদার্থের ধুলো ছিল, তার দেওয়া ঠিকানা মতো কারখানা আর খনিতে গিয়ে সেরকম ধুলো পাওয়া গেল না। কিন্তু যে গাঁয়ে নারীহত্যা হয়েছে, সেখানকার ধুলোয় মিশ্রিত খনিজ পদার্থের গুড়োর সঙ্গে আসামির নখের ধুলো হুবহু মিলে গেল।' তখন আসামি বাধ্য হয়ে অপরাধ স্বীকার করলে।

ভেবে দেখুন, পুলিস যদি অণুবীক্ষণের সাহায্যে গ্রহণ না করত, তাহলে হত স্ত্রীলোকটির পোশাক আর হত্যাকারীর নখের ফাঁক থেকে কিছুই আবিষ্কার করতে পারত না, কারণ, যেসব ধূলিকণা পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো কিছুতেই ধরা পড়ত না সাধারণ দৃষ্টিতে।

আমিও এই পদ্ধতিতেই কাজ করবার চেষ্টা করি। মতিবাবুর লাশের পাশে যে দস্তানাটা আমরা পেয়েছিলুম, সেটা খোয়া না গেলে আমিও হয়তো তার ভেতরকার ধুলো পরীক্ষা করে অনায়াসেই বলতে পারতুম, দস্তানার মালিকের পেশা কি এবং দস্তানার ভেতর ছিল কোন শ্রেণীর ধুলো। আশা করি, আমার বক্তব্য আপনারা বুঝতে পেরেছেন, আর আমার বলবার কিছু নেই।

সতীশবাবু বললেন, হেমন্তবাবু, সেই শুকনো কাদার গুড়ো তো আপনি পরীক্ষা করেছেন বলে শুনেছি, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছেন?

হেমন্ত অবহেলা ভরে বললে, ধুলো পেয়েছি বটে, কিন্তু অত্যন্ত বাজে ধুলো, কোনও কাজে লাগবে বলে মনে হচ্ছে না!..কই মিঃ দত্ত, কোথায় আপনার চা? এতক্ষণ তো পাগলের মতো বকে মরলাম, কিন্তু আর তো চা না হলে চলে না।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়! বেয়ারা, এই বেয়ারা! জলদি চা লে-আও।

চা এল, খাবার এল।

মিঃ দত্ত বললেন, হেমন্তবাবু, আপনার লেকচার শুনে আজ অনেক জ্ঞানলাভ করলুম, ধন্যবাদ!

চা পান করতে করতে হেমন্ত বললে, ওই দরজাটার পর্দার ফাঁক দিয়ে যে ঘরটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে শেলফের ওপরে অত শিশি-বোতল সাজানো কেন? ওটা কি আপনার ডিসপেন্সারি?

—না হেমন্তবাবু, ওটা আমার ডিসপেন্সারি নয়, ও ঘরটি হচ্ছে আমার রসায়নাগার।

—রসায়নাগার?

—আজ্ঞে হ্যা। আপনি তো জানেন, রসায়নশাস্ত্র নিয়ে আমি অল্পবিস্তর পরীক্ষাকার্য করি! যদিও জ্ঞান আমার সামান্য, তবু ওই রসায়নাগারের পিছনে আমি অনেক টাকা খরচ করেছি। আপনি ও ঘরটি দেখবেন?

চায়ের পেয়ালার শেষ চুমুক দিয়ে হেমন্ত হাসতে হাসতে বললে, রবিন জানে, সব ব্যাপারই আমার কৌতুহলের সীমা নেই-বিশেষ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে। আমার লেকচার তো শুনলেন, এইবার রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

—আপনাকে নতুন কথা শোনাবার শক্তি আমার আছে বলে মনে হয় না। বড়ো জোর আমার রসায়নাগারটি আপনার মতো গুণীকে দেখিয়ে ধন্য হতে পারি। চা খাওয়া হয়েছে?

মিঃ দত্তের সঙ্গে আমরা তিনজনেই পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। আমি এই রসায়নাগারের মধ্যে বিশেষ কোনও নতুনত্ব পেলুম না, কারণ, হেমন্তের পরীক্ষাগারের সাজসজ্জার সঙ্গে এরও মিল আছে অনেকটা। সেই শিশি, বোতল, জার, অণুবীক্ষণ, কাচের মাপজোপের গেলাস, বকযন্ত্র প্রভৃতি! তবে এই রসায়নাগারের জন্যে মিঃ দত্ত হেমন্তের চেয়ে ঢের বেশি টাকা খরচ করেছেন, সেটা বুঝতে দেরি লাগে না।

আমি রসায়ন রসে বঞ্চিত, কাজেই এ ঘরের যথার্থ মর্যাদা হয়তো বুঝতে পারলুম না। সতীশবাবুরও অবস্থা বোধহয় আমারই মতো কারণ বোকা বনবার ভয়ে তিনি একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। কিন্তু সমঝদার হেমন্ত কৌতুহলে বালকের মতন চঞ্চল হয়ে উঠল। বিপুল আগ্রহে একবার এটা, একবার ওটা পরখ করে এবং প্রশ্নের পর প্রশ্নে মিঃ দত্তকে যেন আচ্ছন্ন করে দেয়।

—ওটাতে কি আছে। মিঃ দত্ত?

মিঃ দত্ত হয়তো আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য ও অদ্ভুত এক রাসায়নিক পদার্থের নাম করেন ও তার গুণাগুণ বুঝিয়ে দেন।

—আর, ওটাতে?

আবার একটা অচেনা নাম ও গুণাগুণের ব্যাখ্যা ।

—তাকে ওপরে শিশি-বোতলের সঙ্গে এই থার্মসফ্লাস্কটাতে কি আছে মি দত্ত?

—লিকুইড এয়ার!

—লিকুইড এয়ার—অর্থাৎ তরল বা দ্রবীভূত বাতাস? হাওয়াকেও আপনারা জলে পরিণত করেছেন—আশ্চর্য।

—কিছুই আশ্চর্য নয় হেমন্তবাবু। জল দেখা যায়, বাতাস দেখা যায় না। কিন্তু দুই-ই প্রবাহিত হয়, তাই বিজ্ঞানে বাতাসকেও বলে তরল জিনিস বা fluid!

সতীশবাবু এতক্ষণ পরে বললেন, কিন্তু fluid হলেও জলের মতো এই দ্রবীভূত বাতাসকে দেখা যায় না তো?

—দেখা যায় বইকি, খুব দেখা যায়। বাতাস একরকম গ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। বাতাসের তাপ যখন zero-র দুশো সত্তর ডিগ্রী নিচে নামানো যায়, বাতাস তখনই হয় দ্রবীভূত। তাকে তখন দেখতে হয় একরকম জলের মতোই, আর জলের মতোই তাকে এক পাত্র থেকে আর এক পাত্রে ঢালা চলে। দ্রবীভূত বাতাস বিষম ঠান্ডা। কিন্তু তার অবশিষ্ট তাপ আরও নিচে নামিয়ে আনলে সেটা জমে অধিকতর শীতল বরফ হয়ে পড়বে!

আমি বিস্মিত স্বরে বললুম, জলীয় বাতাস শুনেই চমকে গিয়েছি, তারপরেও বাতাস হবে। আবার নিরেট বরফ! অবাক কাণ্ড! তাকে তখন দেখাবে কিরকম?

—অবিকল বরফের মতোই। যদিও সেটা হবে এমন ঠান্ডা যে, সাধারণ বরফকেও তখন গরম বলা যেতে পারবে ওই বাতাস-বরফের সাহায্যে রাসায়নিকরা-বাতাসের চেয়ে তো বটেই, পৃথিবীর সবচেয়ে হাল্কা গ্যাসকে অর্থাৎ হাইড্রোজেনকে দ্রবীভূত করতে পারেন। আর তারপরের ধাপ হচ্ছে বরফে পরিণত হাইড্রোজেন।

সতীশবাবু বললেন, ফ্লাস্কের মুখে ছিপি না দিয়ে, তুলোয় নুটি এঁটে রেখেছেন কেন মিঃ দত্ত? বাতাস দ্রবীভূত হলেও পালিয়ে যেতে পারে তো?

দ্রবীভূত বাতাসও উপে যায় বটে। কিন্তু ফ্লাস্কের মুখে তুলোর বদলে ছিপি এঁটে রাখলে, দ্রবীভূত বাতাস দাড়াম করে পাত্র ফেটে বেরিয়ে আসতে পারে।

হেমন্ত হাসিমুখে বললে, যাক, আমাদের ঋণ গায়ে গায়ে শোধ হয়ে গেল মিঃ দত্ত! আমি শোনালুম সাধারণ ধুলোর কাহিনী! অবশ্য গুণানুসারে আপনারই কৃতিত্ব বেশি। কিন্তু এই দ্রবীভূত বাতাস আপনার কোন কাজে লাগে?

—আমরা—অর্থাৎ রাসায়নিকরা-দ্রবীভূত বাতাসকে ব্যবহার করি অন্য জিনিসকে অতিরিক্ত ঠান্ডা করবার জন্যে। একে অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে বিস্ফোরকরূপেও কাজে লাগানো চলে। কিন্তু বাতাসকেও দ্রবীভূত করা হচ্ছে বহু ব্যয়সাধ্য, ধনী ছাড়া আর কেউ তা পারে না। রসায়নকে শখ করে আমি প্রায় ফকির হতে বসেছি।

হেমন্ত বললে, আজ রাত হয়ে গেল মিঃ দত্ত, আপনার দামি সময় আর নষ্ট করব না! কিন্তু আগে থাকতে এটাও জানিয়ে রাখছি, আপনার মতন বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য যখন হল, তখন সহজে আপনাকে মুক্তি দেব না। আমি আবার এসে নতুন নতুন আশ্চর্য কথা শুনে যাব।

মিঃ দত্ত একমুখ হেসে বললে, বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! অবশ্যই আসবেন, আমার বাড়িতে আপনার অবারিত দ্বার জানবেন!

ঘরের ভিতর থেকে বেরুতে বেরুতে হেমন্ত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, বাতাসের বরফ, বাতাসের বরফ! ধন্য বিজ্ঞান। ধন্য! এবারে এসে হয়তো খেয়ে যাব, গন্ধের বরফি!

—মিঃ দত্ত হো হো করে হেসে উঠে বললেন, না। হেমন্তবাবু আপনাকে অতটা বেশি সৌভাগ্যের অধিকারী বোধহয় করতে পারব না!

পথ দিয়ে আসতে আসতে হেমন্ত আবার সেই নতুন বাড়িখানার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি ভয় পেয়ে পেয়ে বললুম, কি হে, আবার তুমি স্বদেশি আর বিদেশি স্থাপত্য নিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করবে নাকি?

—'না, না, নির্ভয় হও! এ বাড়িখানা হচ্ছে আমার চক্ষুশূল।' বলেই সে হন হন করে এগিয়ে চলল।

বড়ো রাস্তায় পড়ে সতীশবাবু বললেন, এইবার আমাকে থানার দিকে ফিরতে হবে। মিঃ দত্তকে কেমন লাগল?

হেমন্ত উচ্ছসিত স্বরে বললে, চমৎকার, চমৎকার! অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লোক, তিলমাত্র পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই। একটু থেমে স্বর বদলে আবার বললে, সতীশবাবু আপনাকে একটি ফর্দ উপহার দিচ্ছি, কাজে লাগে কি না, দেখবেন।

—উপহার? কি উপহার দেবেন?

—একখানা কাগজ। মতিবাবুর যে নোটগুলো চুরি গেছে এতে তাদের নম্বরগুলো টোকা আছে। এই নিন।

অতিশয় বিস্মিতভাবে সতীশবাবু বললেন, অ্যাঁ! এ কাগজ আপনি কোথায় পেলেন?

—কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করলেই বাধিত হব। দিন দুই-তিন বাদে সবই জানতে পারবেন। চলো রবিন!

হতভম্ব সতীশবাবুকে সেইখানে রেখে আমরা ধরলুম বাড়ির পথ। খানিক দূর এসে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এ কাগজের কথা তুমি আমাকেও বলনি কেন?

হেমন্ত বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বললে, তোমাকে বলে লাভ? তুমি তো একটি আস্ত গাড়ল!

—গাড়ল!

—হ্যাঁ, প্রথম শ্রেণীর গর্দভ। এখানে আমার শুকনো কাদা নিয়ে পরীক্ষার কথা কে তোমাকে বলতে বলেছিল?

—তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে?

—তা নয়তো কি? তোমাকে আগেই বলিনি, এ মামলায় আমি পুলিসকে আমার হাতের তাস দেখাতে চাই না?

—মাপ করো ভাই, ভুলে গিয়েছিলুম!

হেমন্ত হেসে ফেলে বললে, আচ্ছা, এ যাত্রা তোমাকে মাপ করা গেল!

—কিন্তু ওই কাগজখানা?

—কৌতুহলে তুমিও তো আমার চেয়ে কম যাও না দেখছি! ও কাগজ সম্বন্ধে কোনও রহস্যই নেই। আজ সকালে মতিবাবুর ডায়ারিতেই পেয়েছি নোটের নম্বরগুলো। যে পাতায় নম্বরগুলো তোলা ছিল, খুনের দিনেই সেখানা লেখা হয়েছে। অর্থাৎ মাতিবাবু ব্যাঙ্ক থেকে বৈকালে ফিরে এসেই নোটের নম্বর টুকে রেখেছিলেন।...হাঁ, মতিবাবু দেখছি, খুব সাবধানী লোক ছিলেন।

কালকের ও আজকের রাতের কত তফাত। কাল ছিল। অভাবিত কুয়াশায় চারিদিক কালো, আর আজ আকাশ থেকে শহরের মাথায় ঝরে পড়েছে সোনার চাঁদের আলো।

হেমন্তও সেটা লক্ষ করে বললে, আজ তিন দিনে প্রকৃতিদেবী তিনরকম বেশ পরিবর্তন করলেন। পরশু দেখলুম শীতের বাদল, কাল দেখলুম শীতের কুয়াশা, আর আজ দেখছি শীতের জ্যোৎস্না। রবিন তারপর আমাদের পিছনে পিছনে ও আবার কাকে দেখছি।

ফিরে দেখলুম, মতিবাবুর ভাগনে বিনোদবাবু আসছেন। তার চেহারা যেন আরও শুকনো, রোগা ও ছন্নছাড়ার মতো বলে বোধ হল।

হেমন্ত বললে, আরে আরে, বিনোদবাবু যে! এদিকে কি মনে করে?

—কে, হেমন্তবাবু? রাতের ঠান্ডা হাওয়ায় পথে পায়চারি করছি। আজকাল রোজ সন্ধ্যায় বিষম মাথা ধরছে! কিন্তু আপনারা এখানে কেন?

—মিঃ দত্ত আজ আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

—ও, তাই নাকি? আচ্ছা আসি। বলেই তিনি ফুটপাথ দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। তারপর আবার ফিরে এসে বললেন, হেমন্তবাবু, মিঃ দত্ত কি আমার সম্বন্ধে কোনও কথা আপনার কাছে বলেছেন?

—না। কিন্তু আপনার এমন সন্দেহের কারণ কি?

বিনোদবাবু কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, দেখুন হেমন্তবাবু, মিঃ দত্ত আমার হতভাগ্য মামার বিশেষ বন্ধু ছিলেন বটে, কিন্তু আমাকে বোধহয় তিনি পছন্দ করেন না। মামার মৃত্যুর দিনে তার সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হয়েছিল, একথা আপনারা জানেন। কিন্তু তার আসল কারণ কি, সেটা আপনারা শুনেছেন?

—আপনি রেস খেলেন বলে মতিবাবু আপনার ওপরে বিরক্ত হয়েছিলেন তো?

হ্যাঁ, আর মামার কাছে সে খবর দিয়েছিলেন ওই মিঃ দত্তই। এটা কি তার উচিত হয়েছে?

—কেন উচিত হয়নি? আপনি অসৎ সংসর্গে অধঃপাতে যাচ্ছিলেন, তাই তিনি মতিবাবুকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আপনার মঙ্গলের জন্যে।

বিনোদবাবু কেবল বললেন, ও!

হেমন্ত বললে, আপনাকে আমিও একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

—করুন।

—মতিবাবুর হত্যার জন্যে কারুর ওপর আপনার সন্দেহ হয় কি?

—সন্দেহ? কারুর ওপরে সন্দেহ করবার অধিকার আমার নেই। বলেই বিনোদবাবু দ্রুতপদে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

আমরা আবার অগ্রসর হলুম। যেতে যেতে আমি বার বার পিছন ফিরে তাকাতে লাগলুম। কিন্তু বিনোদবাবু একেবারেই অদৃশ্য!

হেমন্ত উচ্চহাস্য করে বললে, রবিন, তুমি বারবার কেন যে পিছন ফিরে তাকাচ্ছ, সেকথা আমি বলতে পারি।

—বালো দেখি।

—তোমার মনের ভাবটা হচ্ছে এইরকমঃ কাল রাতে পথে যখন আমাদের আর পাহারাওয়ালার ওপরে আক্রমণ হয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই ঘটনাস্থলের কাছে বিনোদকে দেখা গিয়েছিল। আজও হল আমাদের পিছনে বিনোদের আকস্মিক আবির্ভাব। এর মধ্যে কোনও যোগাযোগ আছে কি না—বিনোদ আবার লুকিয়ে আমাদের পিছনে বিনোদের আসছে কি না? কেমন এই তো?

হেমন্তর কথা যে সত্য, সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বিনোদলালের অন্তর্ধান

পরদিন বৈকালে বসে বসে হেমন্তের সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময়ে সতীশবাবু এসে ঢুকলেন ঘরের ভিতরে।

হেমন্ত বললে, হঠাৎ এসময়ে? কোনও খবর-টবর আছে নাকি?

সতীশবাবু চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললেন, ভালো মন্দ দুই খবরই আছে।

—যথা?

—সেই ভাঙা কাচের গেলাসের ওপরে আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়াছে।

—হুঁ; সুখবর বটে।

—আমাদের পুরানো দপ্তর থেকে এক আসামির আঙুলের ছাপ বেরিয়েছে। দুই ছাপাই এক আঙুলের।

সাগ্রহে আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে হেমন্ত বললে, কে সেই আসামি?

—একে একে সব বলছি। বিশ বছর আগে জাল নোট চালাবার চেষ্টা করে হরিহর নামে একটা লোক ধরা পড়েছিল। কিন্তু মামলা বিচারাধীন, সেই সময়েই একদিন সে হাজত থেকে সরে পড়েছিল পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে। তারই আঙুলের ছাপের সঙ্গে গেলাসের আঙুলের ছাপ মিলে গেল অবিকল।

—সেই হরিহর এখন কোথায়?

—কেউ তা জানে না। হয়তো তার আসল নাম হরিহরই নয়। যখন সে হাজতে ছিল, তখন অনেক চেষ্টা করেও পুলিস তার যথার্থ পরিচয় আদায় করতে পারেনি। তবে তার কথাবার্তা, হাবভাব ও ব্যবহারে এইটুকু অনুমান করা গিয়েছিল যে, সে ভালো ঘরের ছেলে আর সুশিক্ষিত। পুলিস যার-পর-নাই খোঁজ নিয়েও আর হরিহরের কোনও পাত্তই পায়নি। আজ বিশ বছর পরে হরিহরের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, ভাঙা গেলাসের কাচে। জালিয়াত অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে এসে হয়েছে হত্যাকারী। কিন্তু আবার সে অদৃশ্য হয়েছে।

—হরিহরের ছবি আপনাদের কাছে নেই? সে নাম বদলাতে পারে, চেহারা বদলাতে পারবে না তো?

—ছবি নিশ্চয়ই আছে। এই নিন তার লিপি।

সতীশবাবু একখানা ফোটো বার করে টেবিলের উপরে রাখলেন। আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলুম, একটি অত্যন্ত শান্তশিষ্ট যুবকের চেহারা। চোখ বড়ো বড়ো, নাক টিকলো, দাড়িগোঁফ কামানো, মাথায় লম্বা চুল।

ছবিখানা খানিকক্ষণ মন দিয়ে দেখে হেমন্ত বললে, বিশ বছর আগে হরিহরের বয়স ছিল কত?

—বাইশ-চব্বিশের বেশি নয়!

—তাহলে আজ তার বয়স হবে বিয়াল্লিশ কি চুয়াল্লিশ, এতদিনে তার চেহারার যথেষ্ট পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। আচ্ছা ছবিখানা আজ আমার কাছে থাক।

আমি বললুম, মতিবাবুকে খুন করতে এসেছিল দুজন লোক। বোঝা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে হরিহর; কিন্তু আর একজন কে?

সতীশবাবু ম্লান হাসি হেসে বললেন, সেটাও আমরা আন্দাজ করতে পেরেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেও পুলিসের হাত ছাড়িয়ে লম্বা দিয়েছে।

হেমন্ত সবিস্ময়ে বললে, পালিয়েছে! কে পালিয়েছে?

—শুনুন। মতিবাবুর চোরাই নোটের নম্বরগুলো আপনি কি উপায়ে সংগ্রহ করেছেন, জানি না; কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল, করেন্সি থেকে আজই। কেউ এমন দশখানা হাজার টাকার নোট ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে, যার নম্বরগুলো আছে। আপনারই দেওয়া কাগজে।

—বলেন কি মশাই?

—হ্যাঁ। তারপরেই খবর পেলুম, আজ সকালে বিনোদলালকেও করেন্সি অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে!

—বিনোদবাবু কি বলেন?

—আপাতত বিনোদের মতামত জানবার কোনও উপায়ই আর নেই।

—মানে?

—বিনোদ পালিয়ে গেছে!

—পালিয়ে গেছে! বিনোদ পালিয়ে গেছে? উত্তেজিতভাবে হেমন্ত চেয়ারের উপরে সিধে হয়ে বসল।

—একেবারে নিরুদ্দেশ! করেন্সি অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে এসে আবার কখন যে কোন পথ দিয়ে সে অদৃশ্য হয়েছে, কেউ তা দেখতে পায়নি। বিনোদের নামে ওয়ারেন্ট আমি তৈরী করেই রেখেছিলুম, কিন্তু গ্রেপ্তার করতে গিয়ে দেখি, খাঁচার ভেতরে পাখি আর নেই!

হেমন্ত অর্ধ-স্বাগত স্বরে বললে, বিনোদ পলাতক! বিনোদকে দেখা গেছে, কারেন্সিতে?

অনুতাপ ভরা কণ্ঠে সতীশবাবু বললেন, কি অন্যায়ই করেছি! গোড়া থেকেই ওর ওপরে আমার সন্দেহ হয়েছিল। তখনই যদি গ্রেপ্তার করতুম!

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলুম যে, পালিয়ে গিয়ে বিনোদ নিজেই নিজের অপরাধটা ভালো করে প্রমাণিত করলে। কিন্তু এই বীভৎস ব্যাপারে তার হাত ছিল কতখানি? সে কি হরিহরেরই হুকুম তামিল করেছিল? হরিহরও কি তার সঙ্গেই দেশছাড়া হয়েছে?

হেমন্ত হঠাৎ দৃঢ়স্বরে বললে, নিশ্চিন্ত হন সতীশবাবু। আমাকে আরো দিন তিনেক সময় দিন। তার ভেতরেই বোধহয় এ মামলাটার একটা কিনারা করে ফেলতে পারব।

সতীশবাবু বললেন, এ মামলার একরকম কিনারা তো করে এনেছিই, পাঁজি বিনোদ গাঢাকা দিয়েই তো যত মুশকিলে ফেললে।

হেমন্ত বললে, কিছু ভাববেন না সতীশবাবু, বিনোদলালকে আবার আপনার হাতের কাছে পাবেন খুব শীঘ্রই। পালিয়ে সে যাবে কোথায়? তাকে আপনার মুঠোর ভেতর এনে দেব-এই আমার পণ!

আরো কিছুক্ষণ কথা কয়ে সতীশবাবু নিলেন বিদায়। হেমন্ত চিন্তিত মনে চুপ করে বসে রইল।

আমি বাড়ি যাবার জন্যে যখন গাত্রোত্থান করলুম, তখন সে বললে, রবিন, আজ সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে আর সিনেমায় যেতে পারব না। আমার হাতে আজ অনেক কাজ আছে।

আবার খুন

প্রভাতী চা পান করতে করতে হেমন্তের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল, কুমারটুলির বিখ্যাত খ্যাঁদা বা খোকা-গুণ্ডার কথা।

হেমন্ত বলছিল, এটা তো ইংরেজের আদালতে প্রমাণিত একটা সত্য ঘটনা! বাংলা, ইংরেজি সব কাগজেই এর বিবরণ বেরিয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখো রবিন, খ্যাঁদা আর তার দলবল সন্ধ্যার পরেই গরাণহাটা থেকে একটা হতভাগ্য লোককে প্রকাশ্যভাবে বন্দী করে। কলকাতার জনতাবহুল পথ দিয়ে খানিক খোলা ট্যাক্সিতে চড়ে, আর খানিক পায়ে হেঁটে শোভাবাজার ছাড়িয়ে এল, পথের ওপরেই তাকে খুন করলে; তার কাটামুণ্ড নিয়ে আবার বটতলায় এসে এক বন্ধুকে দেখিয়ে

গেল; তারপর মুণ্ডটা গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়ে এল—অথচ কেউ তাকে কোনও বাধা দিতে পারলে না, পথিকরাও নয়, পুলিসও নয়! কোনও উপন্যাসে এমন ঘটনা বেরুলে, সমালোচকরা অস্বাভাবিক গাঁজাখুরি বলে চেঁচিয়ে ফাটাতেন সারা আকাশখানা! কিন্তু এখন তারা কি বলবেন?

এমন সময় অত্যন্ত হন্তদন্তের মতো সতীশবাবুর সশব্দে আবির্ভাব!

হেমন্ত বললে, কি হয়েছে? আপনার চেহারার অবস্থা তো ভালো নয়?

—'আবার খুন!' বলে সতীশবাবু ধপাস করে চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন।

—হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ! আবার খুন হয়েছে, আর খুনি নিশ্চয়ই সেই বিনোদ।

—আপনি কি বলছেন সতীশবাবু? বিনোদ খুন করেছে? কাকে? মিঃ দত্তকে নয় তো?

—মিঃ দত্তকে সে কেন খুন করবে?

—তার ওপরে বিনোদ মোটেই খুশি নয়।

—না হেমন্তবাবু, খুন হয়েছে একটা নতুন লোক-কিন্তু মতিবাবুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লিপ্ত আছে বলে তাকেও আমরা খুঁজছিলুম।

হেমন্ত আবার বসে পড়ে বললে, ভালো করে সব কথা গুছিয়ে বলুন।

—বলি। ভোরবেলায় খবর পেলুম, গঙ্গার ধারে একটা মড়া পড়ে আছে। দেখতে গেলুম, এমন প্রায়ই যেতে হয়, কারণ, গঙ্গার ধারে লাস পাওয়া নতুন কথা নয়। কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়েই আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল! একটা জোয়ান লোকের লাশ, আর সে মারা পড়েছে ঠিক মতিবাবুর মতোই! মুখে সেই আতঙ্ক, বিস্ময় ও যন্ত্রণার চিহ্ন, আর গলায় সেই সাংঘাতিক নীল দাগ।

—নীল দাগ!

—হ্যাঁ। তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। পরীক্ষা করে বোঝা গেল, লোকটাকে অন্য কোথাও খুন করে তার লাশটাকে এখানে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে। লোকটাকে এখনো কেউ শনাক্ত করতে আসেনি। গায়ে পাঞ্জাবি, তার

পকেটে পেলুম একখানা ছোরা-সুতরাং মানুষটি গোবেচারা ছিল না। পরনে পাজামা, পায়ে রবারের জুতো।

যা সন্দেহ করছেন, তা মিথ্যে নয়। গলায় নীল দাগের সঙ্গে পায়ে রবারের জুতো দেখে আমারও সন্দেহ জেগে উঠল। মতিবাবুর বাড়িতে হত্যাকারীদের একজনের যে রবারের জুতোর মাপ আমরা নিয়েছিলুম, তার সঙ্গে এই জুতোর মাপ একেবারে ঠিকঠাক মিলে গেল!

—এই লোকটাই সেই ভূতপূর্ব জালিয়াত হরিহর নয় তো?

—না। এর আঙুলের ছাপ অন্যরকম।

—তাহলে মতিবাবুর দুই খুনির একজনের সন্ধান পাওয়া গেল?

—তাইতো মনে হচ্ছে। আর এক খুনি নিশ্চয়ই বিনোদলাল। কিন্তু সে তো পলাতক।

—তাহলে এই নতুন হত্যার জন্যে কার ওপরে আপনার সন্দেহ হয়?

—ওই বিনোদের ওপরেই। হেমন্তবাবু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিনোদ এই কলকাতাতেই গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে। খুব সম্ভব, তার সঙ্গে এই লোকটা চোরাই নোটের অংশ নিয়ে গোলমাল করেছিল, কিংবা এ তাকে কোনও রকম ভয় দেখিয়েছিল, তাই বিনোদ গলা টিপে একে বধ করে নিজের পথ সাফ করেছে!

অল্পক্ষণ ভেবে হেমন্ত বললে, কেসটা দাঁড় করিয়েছেন মন্দ নয়, কেবল ধোপে টিকলে হয়।

—কেন?

—তাহলে এর মধ্যে হরিহরের স্থান কোথায়?

—সেইটাই ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো পরে বোঝা যাবে। আপনি কি লাশটাকে দেখবেন?

হেমন্ত তাচ্ছিল্যভর কণ্ঠে বললে, দরকার কি? আমি যে ঘটনার মালা গেঁথেছি, এটা হচ্ছে তারই একটা ঘটনামাত্র। এর পরেও যদি দু-দশটা খুন হয়

তাহলেও আমার ঘটনার মালা নতুন করে গাঁথতে হবে না!' একটু থেমে, হঠাৎ স্বর বদলে সে আবার বললে, 'সতীশবাবু, খুনিকে আপনি আজকেই গ্রেপ্তার করতে চান?'

সতীশবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, সে কি! বিনোদ কোথায় আছে, আপনি জানেন?

—তা নিয়ে আপাতত আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। কারণ, আমি তো আগেই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, বিনোদকে আমি আবার আবিষ্কার করবই! আপাতত বিনোদ সম্বন্ধে সমস্ত ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এখন যা বলি, মন দিয়ে শুনুন। আজ বৈকালে রবিনকে নিয়ে আমি মতিবাবুর শয়নগৃহে যেতে চাই। মিঃ দত্তকেও দরকার হবে, তিনিও এই খুনি-ধরা ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন!.. আপনাকে আরো যা যা করতে হবে বলছি, পাশের ঘরে চলুন। সেইসঙ্গে একটা নতুন জিনিসও দেখাব।

সতীশবাবুর সঙ্গে আমিও পাশের ঘরে যাব বলে ওঠবার উপক্রম করছি, হেমন্ত হেসে উঠে বললে, না। রবিন, কৌতুহল দমন করো—তুমি এই ঘরেই থাকে। তাহলে আজ যখন এই রহস্যনাট্যের শেষ দৃশ্যের উপরে যবনিক, তখন তার বিস্ময়টা তুমি রীতিমতো উপভোগ করতে পারবে।

সতীশবাবুকে নিয়ে হেমন্ত তার পরীক্ষাঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল-আমি একলা বিরক্ত মনে চুপ করে বসে রইলুম।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে ওদের দুজনের মধ্যে ফিসফাস করে কি কথাবার্তা হল, কিছুই শুনতে পেলুম না-যদিও শোনবার জন্যে আমার প্রাণ করছিল ছটফট!

শেষের দিকে কেবল একবার শুনতে পেলুম, সতীশবাবু সবিস্ময়ে বলছেন কি আশ্চর্য!

বিস্ময়ের কারণটা আবিষ্কার করতে না পেরে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল, এবং এই লুকোচুরির জন্যে হেমন্তকে অভিশাপ দিতে লাগলুম বারংবার!

দস্তানার পুনরাবির্ভাব

বৈকালে হেমন্তের সঙ্গে আমি আবার সেই ভয়াবহ ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম মাতিবাবুর শয়নঘর।

সারা বাড়িটা ঠিক সমাধির মতন নীরব। লোকজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তারা সবাই যেন ভয়ে দমবন্ধ করে একেবারে চুপ মেরে গেছে।

মতিবাবুর শূন্য শয্যার দিকে তাকিয়ে মনের ভিতরটা খচখচ করতে লাগল। এই তো মানুষের জীবন। কত সাধে পাতে নরম বিছানা, কিন্তু শোবার আগেই হঠাৎ বেজে ওঠে মহাকালের ঘণ্টা—ঢ়ং ঢ়ং ঢ়ং !

খানিক পরেই মিঃ দত্ত এসে হাজির!

হেমন্ত বললে, আসুন মিঃ দত্ত, নমস্কার! আজও আর একবার আপনাকে কষ্ট দিলুম।

—কষ্ট? কিছুমাত্র না! আপনাদের সাহায্য করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। বলুন, আমায় কি করতে হবে?

—দু-চারটে কথা জানতে চাই। নতুন খুনের কাহিনীটা শুনেছেন তো?

—সতীশবাবুর মুখে শুনলুম। এ কি ভীষণ ব্যাপার, ভয়ে আমার বুক কাঁপছে মশাই! —বিনোদবাবু পলাতক।

—সব শুনেছি। বিশেষ সন্দেহজনক!

—কিন্তু খুনিকে আমি গ্রেপ্তার করবই।

—না হেমন্তবাবু, বিনোদ যে এমন ভয়াবহ কাজ করতে পারে, এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

—মানুষ চেনা বড়ো কঠিন মিঃ দত্ত, বড়ই কঠিন। কিন্তু দু দুটা খুন করে খুনি পালিয়ে যাবে কোথায়? আমার বিশ্বাস সে এইখানেই আছে!

আশ্চর্য হয়ে মিঃ দত্ত বললেন, কোথায়?

—এই বাড়িতেই! মিঃ দত্ত, এ বাড়িখানা যেমন মস্ত, তেমনি সেকেলে। এখানে আনাগোনা করছেন আপনি অনেকদিন। আপনি কি বলতে পারেন, এ বাড়ির কোথাও কোনও চোরকুঠরি আছে কি না? সেকেলে বাড়িতে প্রায় চোরকুঠরি থাকত!

আপনি কি মনে করেন, বিনোদ এই বাড়িতেই লুকিয়ে আছে? তা কেমন করে হবে? না মশাই, আমি কোনও চোরকুঠরির সন্ধান-টন্ধান জানি না।

—মতিবাবুর মুখেও কোনোদিন শোনেননি?

—না।

—আচ্ছা, আমার কাছে ভালো করে এই বাড়িটার বর্ণনা করতে পারেন?

—তা নিশ্চয়ই পারি! এ বাড়ির সবটাই আছে আমার নখদর্পণে!

তারপর প্রায় আধঘণ্টা ধরে দুজনের মধ্যে চলল প্রশ্নোত্তরের ঘটা। শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠলুম। মনে হল সমস্তটাই যেন অর্থহীন। বিনোদ নিশ্চয়ই এ বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে নেই-সে। এমন কাঁচা ছেলে নয়! হেমন্তের ধারণা ভুল।

হঠাৎ একজন পাহারাওয়ালা এসে জানালে, ইনস্পেক্টরবাবুর কাছ থেকে একজন হেমন্তবাবুকে ডাকতে এসেছে!

—আমাকে? আমাকে আবার কি দরকার? বলে গে যাও, আমি এখন ভারী ব্যস্ত। আচ্ছা থাক, আমি নিজেই যাচ্ছি। এসো তো রবিন, খবরটা কি শুনে আসি।

আমরা নিচে নেমে গেলুম। কিন্তু নিচে গিয়ে কারুকেই দেখতে পেলুম না।

হেমন্ত বললে, কে ডাকতে এসেছে? গেল কোথায়?

মিনিট ছয় অপেক্ষা করেও কারুর দেখা পাওয়া গেল না। হেমন্ত বিরক্ত হয়ে বললে, চুলোয় যাক ইনস্পেক্টরবাবুর লোক। আমার এখন অনেক কাজ। চলো, আবার উপরেই যাই।

ঘরে ঢুকে হেমন্ত আবার টেবিলের সামনে গিয়ে বসে পড়ল। মিঃ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কে এসেছিল?

কেউ না। কেবল মিছে সময় নষ্ট হল। হ্যাঁ, কি বলছিলেন? এ বাড়ির সিঁড়ির তলায় চোরকুঠরির মতো একটা ঘর আছে, কিন্তু সে ঘরে কয়লা থাকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে আপনার মতে বিনোদ এখানে নেই?

—না।

মিনিট পাঁচেক ধরে হেমন্ত গভীর মুখে ভাবতে লাগল। তারপর ঘরের বাইরে সিঁড়ির উপরে শুনলুম ভারি ভারি পায়ের শব্দ! দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন হাসিমুখে সতীশবাবু।

হেমন্ত বললে, এই যে, আসুন! ব্যাপার কি সতীশবাবু? একমুখ হাসি যে?

মিঃ দত্ত আগ্রহ ভরে বললেন, বিনোদের খোঁজটোজ পেয়েছেন বুঝি?

—না, পেয়েছি খালি এই জিনিস দুটো। বলেই সতীশবাবু পকেট থেকে বার করলেন একজোড়া সাদা দস্তানা।

হেমন্ত দস্তানা দুটো সতীশবাবুর হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বললে, হুঁ। এর একটা দস্তানা আমি যে চিনি! রক্তের দাগ আর নেই বটে, কিন্তু কাচ দিয়ে কাটা অংশটা এখনও তেমনিই আছে!

মিঃ দত্ত উত্তেজিত স্বরে বললেন, তাই নাকি? কই দেখি-দেখি।

—এই নিন।

মিঃ দত্ত দস্তানা নেবার জন্যে দুটো হাত ব্যাগ্রভাবে বাড়িয়ে দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে হেমন্ত দস্তানা ফেলে নিজের দুহাতে তাঁর হাত দুখানা জোরে চেপে ধরলে এবং পরমুহূর্তেই সতীশবাবু টপ করে তার জোড়া হাতে পরিয়ে দিলেন হাতকড়ি!

বিস্ময়ে ও ক্রোধে অভিভূত হয়ে মিঃ দত্ত কয়েক মুহূর্ত একটাও কথা কইতে পারলেন না। তারপর চিৎকার করে বললেন, হেমন্তবাবু! এসব কি প্রহসন?

হেমন্ত বললে, প্রহসন নয়। হরিহর, বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য!

—হরিহর! কে হরিহর?

—তুমি হরিও হতে পারো, হরও হতে পারো, দত্তও হতে পারো! কোনটা তোমার আসল নাম, কেউ জানে না!

সতীশবাবু কঠোর স্বরে বললেন, মিঃ দত্ত, মতিবাবুকে খুন। আর আশি হাজার টাকা চুরির অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলুম।

— কোন প্রমাণে?

হেমন্ত বললে, দত্ত, প্রমাণ কি একটা আছে? আজও তুমি মতিবাবুর টানা থেকে মতিবাবুরই চাবি দিয়ে যে চল্লিশ হাজার টাকার হিরে মুক্তো, পান্না-চুনিচুরি করেছ, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। সতীশবাবু, দত্তের জামাকাপড় খুঁজে দেখুন তো।

মিঃ দত্ত বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সতীশবাবু তাকে ধরে একবার ঝাঁকুনি দিতেই তিনি ঠান্ডা হয়ে গেলেন। তাঁর পকেটের ভিতর থেকে সত্যসত্যই চোরাই মাল ও মতিবাবুর চাবির গোছা বেরিয়ে পড়ল।

হেমন্ত বললে, দত্ত, এখন তুমি অপরাধ স্বীকার করবো?

মিঃ দত্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

হেমন্ত বললে, আচ্ছা, তবে আমার মুখ থেকেই তুমি নিজের কাহিনী শোনো। তোমাকে তো সেদিনও বলেছি দত্ত, এখনকার বৈজ্ঞানিক-পুলিসকে অপরাধীর স্বীকার-উক্তির ওপরে নির্ভর করতে হয় না। তুমি পাথরের মতো বোবা হয়ে থাকলেও ফাঁসিকাঠ তোমাকে ক্ষমা করবে না।

হেমন্তের কথা

সতীশবাবু, আমি সংক্ষেপেই সব বলব। যবনিক পতনের সময় বেশি বাক্যব্যয় ভালো নয়।

বিনোদের উপরে আমার একবারও সন্দেহ হয়নি—সে মাতাল ও জুয়াড়ি জেনেও । প্রথমত, মদ খাওয়া, জুয়াখেলা আর খুন করা এক কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এটা ভালো করেই জানা গিয়েছে যে, খুনের সময় সে বাড়িতে ছিল না। সে যে সত্যসত্যই রাত বারোটা পর্যন্ত থিয়েটারে ছিল এবং তারপরে রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত ছিল হোটেলে, এর প্রমাণ আমি নিজে গিয়ে সংগ্রহ করেছি। হোটেল থেকে সে ফিরে এসেছিল প্রচণ্ড মাতাল হয়ে। সে এমন বেহুঁশ হয়েছিল যে, খেতে গিয়ে জামাকাপড়ে ঢেলেছিল। মাংসের ঝোল আর জামাকাপড়ের নানা জায়গা পুড়িয়ে ফেলেছিল সিগারেটের আগুনে। এমন চৈতন্যহীন মত্ত অবস্থায় কেউ এভাবে এত চালাকি খেলিয়ে চুপি চুপি খুন করতে পারবে না। সতীশবাবু, কেবল এই একটিমাত্র কারণে বিনোদের উপর সন্দেহ করা আমাদের উচিত হয়নি। বেহুঁশ মাতাল যে খুন করতে পারে না, একথা আমি বলছি না। আমার মনে হচ্ছে, খুব বেশি মাতাল এত গোপনে খুন করে সরে পড়তে পারে না।

তবু যে সে পালিয়ে গেছে, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, পুলিস, তাকে গ্রেপ্তার করতে চায়, কোনো গতিকে এটা সে জানতে পেরেছিল, এবং পালাবার আগে সে যে করেন্সি থেকে রাহাখরচের জন্যে নিজের কিছু টাকা ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, এটা আমরা আনায়াসেই অনুমান করতে পারি।

আপনারা সন্দেহ করেছিলেন, হত্যাকারী হচ্ছে, বাড়ির লোক। কারণ, বাড়ির সব দরজা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ, এবং কুকুরটা চেনা লোক দেখেই চ্যাঁচায়নি। কিন্তু কাদামাখা পদচিহ্ন ও অচেনা রবারের জুতোর অস্তিত্ব দেখেই আমি বুঝেছিলুম, খুনিরা এসেছে বৃষ্টির পরে, রাস্তা থেকেই। আমি মনে মনে খুনের রাতের ঘটনাগুলো সাজিয়েছিলুম। এইভাবে (অবশ্য এটা জানবেন যে,

সমস্ত প্লটটা একদিনে একসঙ্গে হঠাৎ আমার মনের ভিতরে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি!!কোনও ঘটনাসূত্র পেয়েছি আগে, আবার গোড়ার দিককার কোনও সূত্র পেয়েছি শেষের দিকেই।)

ধরুন, রাম আর শ্যাম মতিবাবুকে খুন করবে। রাত সাড়ে দশটার সময় মতিবাবুর বাড়িতে ঢোকবার দরজা বন্ধ হয়, খুনিরা সে খবর রাখে। রাত নটার সময় বৃষ্টি থামল। রাম ও শ্যাম ঘটনাস্থলে প্রবেশ করলে। রামের সঙ্গে মতিবাবুর চেনাশোনা ছিল। মতিবাবু তখনও শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করেননি, পরিচিত লোক বলে রাম বিনা আহ্বানেই ভিতরে গিয়ে ঢোকে। কুকুরটাও রামকে বিলক্ষণ চিনতে, তাই গোলমাল করেনি। আর রামের সঙ্গে গিয়েছিল বলে, শ্যামকে দেখেও চ্যাঁচায়নি। শ্যাম নিশ্চয় দরজার বাইরে এক-আধ মিনিট অপেক্ষা করেছিল, কারণ তার জুতোর স্পষ্ট ছাপ আমরা পেয়েছি। চলন্ত লোকের পায়ের ছাপ আর দণ্ডায়মান লোকের পায়ের ছাপ একরকম হয় না, এটা সকলেই জানে। পরে রামের আহ্বানে শ্যামও তাকে সাহায্য করবার জন্যে ঘরের ভিতরে যায়। কাজ শেষ করে দুজনেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। রাত সাড়ে দশটায় সময়ে দ্বারবান রাস্তার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয়। কাজেই বাইরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

রাম হচ্ছে মতিবাবুর বন্ধু, সে তাঁর সব অভ্যাসের কথা জানে। ডায়ারির ভিতরে মতিবাবুর কোনও কোনও গুপ্তকথা আছে, এটাও হয়তো তার অজানা ছিল না। খুনের রাতে হয়তো কোনও কারণে ভয় পেয়ে বা সময় অভাবে সে ডায়ারি পড়বার সুযোগে পায়নি। কিন্তু পরে যথাসময়ে কাজে লাগাতে পারবে বুঝে ডায়ারি আর চাবির গোছা নিয়ে পালায়। সে এ বাড়ির বন্ধু, খুনের পরও এখানে তার প্রবেশ বন্ধ হবার ভয় নেই। খুব সম্ভব, রাম হ্যান্ডনোটে মতিবাবুর কাছ থেকে বারে বারে টাকা ধার করেছিল, তাই যাবার সময়ে নির্বিচারে সব হ্যান্ডনোটও সঙ্গে নিয়ে পালায়।

ঘটনাস্থলে এসে মতিবাবুর মৃতদেহ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। লাশের গলায় ওই নীল দাগটা কিসের? আঙুলের চাপে ঠিক ওরকম কালশিরা পড়ে না। তারপর লাশের পিঠের তলায় ওই ভাঙা কাচের টুকরো থাকার মানে কি? ধস্তাধস্তি হল বিছানায়, কুঁজের মুখ থেকে গেলাস কেন এখানে এল, কেনই বা ভাঙল, কেনই বা একজন খুনির হাত কাটল?

আমার মন বললে, একজন খুনি গেলাসে কোনও বিষাক্ত পদার্থ ঢেলে মতিবাবুর কাছে আসে। আর একজন তাঁকে চেপে ধরে। মতিবাবুকে গেলাসের বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা হয়। —তিনি ধস্তাধস্তি করতে করতে বিছানা থেকে নেমে পড়েন এবং সেই মুহূর্তেই গেলাসের বিষ তাঁর গলায় ঢেলে দেওয়া হয়। সে বিষ এমন ভয়ানক যে, মতিবাবু চাঁচাবারও সময় পাননি-কিন্তু তীর ধস্তাধস্তির চোটে খুনির হাতের গেলাস ভেঙে খুনির হাত কেটে যায়। তারপর ভাঙা কাচের ওপরে গিয়ে পড়ে মতিবাবুর দেহ। সব ব্যাপার ঘটে দু-এক সেকেন্ডের মধ্যে।

বিষ যদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই মতিবাবুকে গলা টিপে মারা হয়নি। কিন্তু ডাক্তাররা শবদেহে বিষের কোনও অস্তিত্ব পাননি। তবু আমার সন্দেহ গেল না। কারণ ওই ভাঙা গেলাস! ওটা না থাকলে আমি ডাক্তারদের কথাই বিশ্বাস করতুম। কিন্তু গেলাস যখন পাওয়া গেছে, মাতিবাবুকে নিশ্চয়ই কিছু খাওয়ানো হয়েছে। সেটা কি হতে পারে? হয়তো এমন কোনও নতুন বিষ, ডাক্তাররা যার নাম জানেন না।

আপনারা কেউ লক্ষ করেননি, কিন্তু দত্তকে প্রথম দিন দেখেই আমি লক্ষ করেছিলুম তার ডান হাতের ওপর ফ্রেসকলোরে ‘প্লাস্টার’ লাগানো আছে। গোয়েন্দার প্রথম কর্তব্য, সকলকে সন্দেহ করা। খুনির হাত বা আঙুল কেটেছে, তার প্রমাণ রয়েছে, দত্তের আঙুল কাটা! দত্ত হচ্ছে মতিবাবুর বন্ধু। তার এ বাড়িতে অবাধ গতি এবং সে হচ্ছে রাসায়নিক, তার পক্ষে কোনও অজানা বিষের অস্তিত্ব জানা অসম্ভব নয়। এ সন্দেহগুলো আমার মাথায় ঢুকেছিল; কিন্তু সন্দেহমাত্র।

ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত ওই দস্তানার রহস্য নিয়েও অনেক ভেবেছিলুম। কারণ ওরকম পুরু পশমি দস্তানা কেউ হাতে পরে না, বিশেষ বাংলাদেশে। তবে প্রথমে কোনোই সুদত্তর পাইনি। পরে বুঝেছি, ওই দস্তানটা ছিল হরিহরের-অর্থাৎ দত্তের সঙ্গীর হাতেই। সেই ই দস্তানা পরা হাতে কাচের গেলাসটা ধরেছিল, আর কাচের গেলাসটা তাকে দিয়েছিল, দত্তই। সেই সময়েই গেলাসের গায়ে দত্তের আঙুলের ছাপ পড়ে। কিংবা গেলাসটা ভাঙবার পর দত্ত তার ওপরে হাত দিয়েছিল।

কিন্তু রক্তমাখা দস্তানাটা কেন আমি নিয়ে যেতে চাই, সেটা জানবার জন্যে দত্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছিল! তারপর সে চলে যায় ও পথে আমরা আক্রান্ত হই। পাহারাওয়ালার কাছ থেকেও ভাঙা গেলাসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা হয়। আমার কাছে দাস্তানা আর পাহারাওয়ালার কাছে ভাঙা গেলাস আছে, একথা বাইরের লোকের মধ্যে কেবল দত্তই জানত। সেজন্যেও তাকে আমি সন্দেহ করি। কিন্তু কেবল সন্দেহ করে তো লাভ নেই, আগে দরকার প্রমাণ। সতীশবাবু আমি যে দু একটি বিষয় প্রথমে আপনার কাছে লুকিয়েছিলুম, পরে আজই সকলে আপনার কাছে প্রকাশ করেছি। ঘটনাস্থলের কর্দম-চুর্ণ পরীক্ষা করবার পর তার মধ্যে আমি কাদার সঙ্গে পেয়েছিলুম চুন, সুরকি, বালি ও কয়লার গুড়ো। যেদিন আমরা দত্তের বাড়িতে চা খেতে যাই, সেদিন দেখলুম তার পাশেই রয়েছে কয়লার দোকান। গলির সেখানটায় মাটির সঙ্গে চুন, বালি, সুরকি ও কয়লার গুড়ো ছড়ানো। তার দু-তিন খানা বাড়ির পরেই দত্তের বাড়ি। সুতরাং এখানকার মাটি মাড়িয়ে তাকে রোজই আনাগোনা করতে হয়। বৃষ্টিতে পথে কাদা হলে এখানকার কাদার চাপ যে তার জুতোর গোড়ালি আর সোলের ফাঁকে লেগে থাকবে, এটা বেশ সহজেই বোঝা যায়! ওই নতুন বাড়ি ও কয়লার দোকানই দত্তের প্রতি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

দত্তের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে আমি সকলের অগোচরে সেই নতুন বাড়ির সামনের পথ থেকে একমুঠো ধুলো তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম। পরে পরীক্ষা করে দেখেছিলুম, আগেকার কর্দম-চুর্ণ আর এই একমুঠো ধুলোর উপাদানে

কোনও প্রভেদই নেই। মতিবাবুকে যে খুন করেছে, ওই নতুন বাড়ির সামনেকার মাটি মাড়িয়েই তাকে যেতে হয়েছে।

তারপর দত্তের রসায়নাগার দেখে আমার সন্দেহ আরও বেড়ে উঠল। সেখানে আবিষ্কার করলুম, দ্রবীভূত বাতাস। আমি রসায়নশাস্ত্র পড়েছি, রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি; কিন্তু সেদিন দত্তের সামনে ন্যাকা সেজেছিলুম, তার কাছ থেকে কথা আদায় করবার জন্যে।

ধাঁ করে আমার মাথায় একটা ভীষণ সত্যের ইঙ্গিত জাগল! দ্রবীভূত বাতাসকেই দত্ত বিষের মতো ব্যবহার করেছে! সতীশবাবু, আপনি হয়তো জানেন না, এই দ্রবীভূত বাতাসকে রাসায়নিকরা নানা নির্দোষ কাজে লাগান বটে, কিন্তু এ জিনিস মানুষের মুখের ভিতরে ঢেলে দিলে তখনই তাঁর মৃত্যু হবে, অথচ মৃতদেহে তার কোনও চিহ্নই পাওয়া যাবে না। কি মারাত্মক বুদ্ধি চাতুরী! ভাগ্যে দ্রবীভূত বাতাস হচ্ছে অত্যন্ত দুর্লভ জিনিস—সাধারণ হত্যাকারীর নাগালের বাইরে! নইলে দ্রবীভূত বাতাস মানুষের সমাজে বিভীষিকা সৃষ্টি করতে পারত।

দ্রবীভূত বাতাস এমন ভয়ানক ঠান্ডা যে, পরীক্ষাগারে হাতে পুরু দস্তানা না পরলে কাচের পাত্রে তাকে নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব। এইজন্যেই হত্যাকারী হাতে দস্তানা পরে কাচের গেলাসে দ্রবীভূত বাতাস ঢেলে মতিবাবুকে তা পান করতে বাধ্য করেছিল!

তারপর হরিহরের অস্তিত্ব আবিষ্কার! সতীশবাবু আমাকে যে ছবি দিয়েছিলেন, তাতে হরিহরের মুখে দাড়ি গোঁফ নেই, কিন্তু দত্তের মুখে গোঁফ আর ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। দত্তের বয়স এখন চল্লিশের ওপরে, তার মুখেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু হরিহরের মুখের সঙ্গে দত্তের মুখের কিছু কিছু সাদৃশ্য আমি পেয়েছিলুম। আমি কিছু কিছু ছবি আঁকতেও জানি। হরিহরের চোখ, নাক, ঠোঁট অনেকটা দত্তের মতোই। তাই কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে হরিহরের ছবির মুখে বসিয়ে দিলুম দত্তের মতো গোঁফ আর ফ্রেঞ্চ-কাট দাঁড়ি! ফল হল বিস্ময়কর! বুঝেছি রবিন, সতীশবাবু সেই ছবি দেখে সেখানাকে প্রথমে দত্তের

ছবি বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তারপর আমাদের জানতে বাকি রইল না, আমাদের দত্তমশাই-থুড়ি, মিঃ দত্ত হচ্ছেন কোনও দেশের বাজপাখি!

'লিকুইড এয়ার' দিয়ে দত্ত তার পাপ কাজের সঙ্গীকেও পাঠিয়ে দিয়েছে যমের বাড়ি। কি করে তাকে মারা হয়েছে, এখনও তা প্রকাশ পায়নি বটে, তবে হত্যাকারী যে দত্ত, তাতে আর সন্দেহ নেই। দ্রবীভূত বাতাসের এমন ভয়াবহ ব্যবহার পৃথিবীর আর কোনও অপরাধী বোধহয় জানে না। দত্ত তাকে মেরেছে কেন? একজন সাক্ষী বা অংশীদার বা পথের কাঁটা সরাবার জন্যেই।

দত্ত জানত, আমি রসায়নশাস্ত্র নিয়ে অল্প-বিস্তর নাড়াচাড়া করি। তার ভয় হয়েছিল, এরকম অসাধারণ দস্তানা দেখে আমার মনে দ্রবীভূত বাতাস সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত জাগা হয়তো অসম্ভব নয়। অপরাধীর মন কিনা! তাই উপর চালাকি করতে গিয়ে, দস্তানা কেড়ে নিয়ে আমার হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হয় মতিবাবুর ডায়ারিখানা!

আর একটু বাকি আছে। দত্তকে হাতেনাতে ধরবার জন্যে আজ আমি এখানে ফাঁদ পেতেছিলুম! খুনির পকেট থেকে ডায়ারি হস্তগত করেই আমি বুঝেছিলুম, খুনি যখন মতিবাবুর চাবি নিয়ে গেছে, তখন টেবিলের গুপ্তস্থান থেকে চল্লিশ হাজার টাকার হিরে-মুক্তো চুরি করার প্রথম সুযোগ সে কখনোই ছাড়বে না! দত্তের আবির্ভাবের আগেই আমি টেবিলের ডানদিকের টানার ফাঁকে এমনভাবে একটা আলপিন ঢুকিয়ে রেখেছিলুম যে, কেউ টানা খুললেই আলপিনটা সরে পড়ে যাবে।

তারপর দত্ত এল। পাহারাওয়ালাকে শেখানো ছিল, সে একটা বাজে কথা বলে আমাদের বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। দত্ত রইল ঘরে একা! মিনিট কয় পরে আমরা ফিরে এলুম। টেবিলের কাছে গিয়ে দেখি, টানার ফাঁকে আলপিন নেই। তখনই বোঝা গেল, দত্ত সুযোগের অপব্যবহার করে নি!

এদিকে দত্ত যখন এখানে বসে আমার সঙ্গে কথা কইছে সতীশবাবু তখন গিয়েছেন দত্তের রসায়নাগার ও বাড়ি খানাতল্লাস করতে! তারই ফলে আবিস্কৃত হয়েছে দস্তানাজোড়া! ওই দস্তানাও এই মামলায় এক বড়ো সাক্ষীর কাজ করবে।

দত্ত, এখনও কি তুমি অপরাধ স্বীকার করবে না? দেখছ তো, তোমার প্রতি পদক্ষেপের হিসাব রয়েছে আমার কাছে! অতিরিক্ত চালাকের মতন তুমি খুনের জন্যে এমন একটা দিন নির্বাচন করেছিলে, যেদিন হয়েছিল মতিবাবুর সঙ্গে বিনোদের ঝগড়া! তারপরে আমাদের ভিতরে খবর জানবার আর বিনোদের উপরে দোষ চাপাবার জন্যে তুমি সেজেছিলে পুলিসের সাহায্যকারী বন্ধু। তুমি হচ্ছে গভীর জলের মাছ! অসাধারণ মস্তিষ্কচালনা করেছিলে বটে, কিন্তু পাপীর সমস্ত চাতুর্যই মিথ্যা। ভগবান ঘুমিয়ে থাকেন না!

এত সেয়ানা হয়েও দত্ত ধরা পড়ল প্রধান তিনটে কারণে। প্রথমত, সেই তুচ্ছ চুন-বালিসুরকি-কয়লার গুড়ো। দ্বিতীয়ত, ভাঙা কাচের উপরে তার আঙুলের ছাপ। তৃতীয়ত, উপর চালাকি করে সে যদি আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ না করত, তাহলে আমিও দ্রবীভূত বাতাসের অভাবিত ও বিস্ময়কর ব্যবহারটা আন্দাজে কল্পনা করতে পারতুম না! বলতে কি, দ্রবীভূত বাতাসের কথা একবারও আমি ভাবিনি। কিন্তু দত্তের রসায়নাগারে ওই দুর্লভ জিনিসটিকে দেখেই আমার মনের ভিতরে জেগেছিল একটা আশ্চর্য সন্দেহ!

সতীশবাবু, এখনও আপনি বিনোদকে গ্রেপ্তার করতে চান? কিন্তু আর সে আপনাকে ভয় করবে না, দুদিন পরেই আবার তার দেখা পাবেন। খবরের কাগজে হত্যাকারীর গ্রেপ্তারের বিবরণ বেরুলেই বিনোদ আর অজ্ঞাতবাস করতে রাজি হবে না!

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিনোদ এবারে ভালো ছেলে হবে। সতীশবাবু, আর একটা কথা। ইউরোপে এখন বিজ্ঞান জানা খুনি, চোর বা অপরাধীর দল রীতিমতো ভারি। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে, এদেশের অপরাধীরা এখনও পাপ কাজে বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে শেখেনি। অবশ্য এটা সকলেই জানে যে, বিখ্যাত

পাকুড় খুনের মামলায় প্রকাশ পেয়েছে; অপরাধীরা হত্যাকার্যে প্লেগের জীবাণু ব্যবহার করে অভাবিত চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছে! কিন্তু এ শ্রেণীর শিক্ষিত অপরাধী এখানে দুর্লভ। নইলে এ দেশি পুলিশকে সাত হাত জলের তলায় পড়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাবুডুবু খেতে হত! তবু আমার মত হচ্ছে, এদেশের পুলিসের উচিত, বিজ্ঞান সম্বন্ধে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা। কেননা, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষেও বৈজ্ঞানিক অপরাধীর দল ভারি হওয়ার সম্ভাবনা আছে যথেষ্টই!

এস রবিন, শ্রীমান দত্তের সামনে পরলোকের দরজা খুলে দিয়ে এখন আমার সসম্মানে প্রস্থান করি। নমস্কার, সতীশবাবু। দত্ত, কিছু মনে কোরো না। তোমাকে আর নমস্কার করবার ইচ্ছা হচ্ছে না!